KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 200	Place of Publication ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number ১২/- ১৫/- ১৯/- ২০/- ২০/-	Year of Publication ভাদ্র ১৩৭১ ॥ Sep 1964 জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ ॥ June 1968 কার্তিক ১৩৭৮ ॥ Nov 1971 আষাঢ় ১৩৭৯ ॥ July 1972 অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ ॥ Dec 1972
	Condition Brittle Good ✓
Editor আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks

C. D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

উনবিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৭৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় ওজনের
ব্যাপার.....সারা জীবন, সারা কাজ, সব কিছু
মেপেজুপে করতে হয়.....
আপনার উচ্চতা, আপনার দেহের ওজন.....আপনার
পোশাক, আপনার প্রয়োজনের সামগ্রী.....
চাল ডাল.....দুধ ঘী.....
আপনার গায়ের তাপ.....দিনের তাপমাত্রা.....
কিংবা আপনার রক্তের চাপের হ্রাস বৃদ্ধি সব.....
স.....ব.....মেট্রিক মাপ ও ওজনে.....
ওজন ছাড়া সভ্য মানুষের জীবনযাত্রাই অচল, যে কোনও
কাজই হ'ক তাতে ওজন দরকার। আপনাকে ওজনের
কারবার যখনই করতে হবে তখনই আপনি সঠিক
মাপের ওপর জোর দেবেন। সন্দেহ করার মত কিছু
দেখলে অবিলম্বে আপনার এলাকার ইন্সপেক্টর অফ
ওয়েট্স্ এ্যাণ্ড মেজার্সকে খবর দিন।

মা আমার ওজন করছো কি কিলোগ্রামে ?

মেট্রিক পদ্ধতি—জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

davp 71/205

ঊনবিংশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' আটাত্তর

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

মালঞ্চের মালাকর ॥ নবেন্দু সেন ৩৩৭

বাংলার লোকশিল্প ॥ আশুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৫২

মৃত্যুচেতনা : জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুখরঞ্জন চক্রবর্তী ৩৬১

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা ॥ অশোক কুণ্ডু ৩৬৯

সমালোচনা : উষাম্ব ॥ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৩৭৩

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

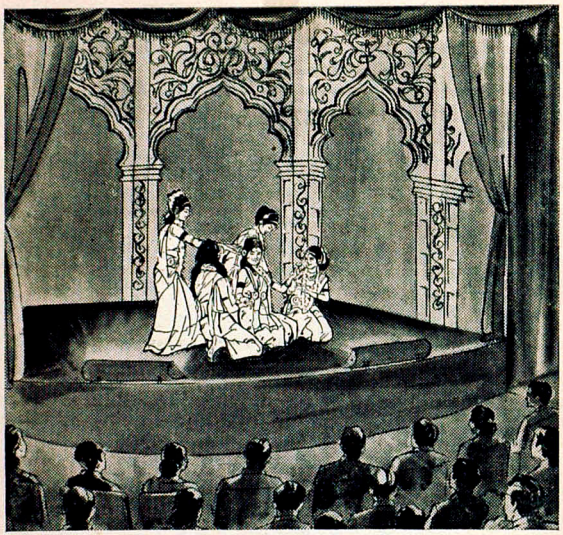

Not by bread alone

Cultural activities mean a fuller life. These need not be confined to the well-to-do; at least, not in Jamshedpur, where the Community Centres in the low income areas provide ample scope for self-expression and enjoyment. The other activities at these Centres include sewing and knitting classes, kindergartens; music and dance classes.

This urban Community Development Programme owes its success to the enthusiasm of the participants and the spirit of the Steel Company which cares deeply for the welfare of the people of Jamshedpur.

TATA STEEL

TI: 1342A1

কার্তিক
তেরশ' আটাত্তর

সমকালীন

উনবিংশ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

মালঞ্চের মালাকর

নবেন্দু সেন

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০—১৯২৫) বাংলা দেশ তথা ভারতের গৌরব। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ; কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কোন পরিচয় নেই বললেই চলে। অবশ্য চিত্তরঞ্জন বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের ন্যায় সচেতন, বিশিষ্ট, কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের জীবন ও ব্যক্তিত্বের থেকে তাঁর সাহিত্য রচনা পৃথকও ছিল না। বস্তুত তাঁর গদ্য রচনার অধিকাংশই তাঁর কর্মময় জীবনের প্রত্যক্ষ ভাষ্য ; কিন্তু বিস্ময় জাগে তাঁর কবিতাগুলির ক্ষেত্রে। চিত্তরঞ্জনের কাব্য কবিতাগুলি কেবল সংখ্যার দিক থেকেই নগণ্য নয় গুণগত উৎকর্ষেও তার বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। একজন দেশনেতার কলম থেকে সাময়িক প্রয়োজনে কবিতা বা সৃষ্টিশীল রচনা সম্ভব হতে পারে কিন্তু প্রাত্যহিকতার উর্ধ্বে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা মতবাদের বাইরে সৃজনশীল রচনার পরাকাষ্ঠায় যা আস্বাদমান তার সাহিত্যিক রসমূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। চিত্তরঞ্জনের কবি মানসিকতার পরিচয় এদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধে সেদিকের প্রতিই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল মাত্র। নীচে চিত্তরঞ্জনের কাব্য ও কবিতার একটি সাধারণ পরিচিতি দেওয়া হল।

'মালঞ্চ' (১৮৯৫): সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উদ্যোগে এই কাব্য সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের একাধিক কবিতা 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। অজ্ঞেয়বাদ, নাস্তিকতা এবং উষ্ণ প্রেম-চিন্তা, মূলত এই দুটি বক্তব্যই মালঞ্চের মূল সুর। নিষ্ঠাবান ধার্মিকদের নিকট এই গ্রন্থের সুর ও রঙ কিছুটা মোটা ও চড়া বোধ হত ; ফলত সকলের নিকট 'মালঞ্চ' সহজপাচ্য ছিল না।

'মালা' (১৯০৪): চিত্তরঞ্জনের দ্বিতীয় কবিতার বই। এ কাব্যেরও বিষয়বস্তু প্রেম ;

তবে 'মালঞ্চে'র অশান্তরূপে নয়, ভাব-নিবিড়তায় সঘন।

'সাগর সঙ্গীত' (১৯১৩): চিত্তরঞ্জনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই কবির বিলাত যাত্রার সময় (১৮৯০, ১৯১১) রচিত। প্রথমবারের কবিতাগুলি 'সাগরে' এবং 'সাগরতীরে' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ আত্মমগ্ন কবির অন্তর্ভূতিতে সমুদ্র-চিন্তা নবীনরূপে উপস্থিত হয়েছে এখানে। সমুদ্রের বিশালতায় চিত্তালোকের আনন্দানুভূতি এ কাব্যে রোমান্টিকতার সোপান পার হয়ে এক ধরণের মিষ্টিসিজিমে উন্নীত হয়েছে।

'অন্তর্যামী' (১৯১৪): 'কিশোর-কিশোরী' (১৯১৪): এই ভাবানুভূতির আরো পরিণত রূপ। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন চিন্তার সমান্তরাল রহস্য-সুন্দর আত্মমুখীন (subjective) নিবিড়তায় পুষ্ট এই গ্রন্থের কাব্যমূল্য বিশেষভাবে বিচার্য। 'কিশোর কিশোরী' (১৯১৪) চিত্তরঞ্জন-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কাব্যও বৈষ্ণবীয়। রাধা-কৃষ্ণের অমল কৈশোর প্রেমের পটভূমিকায় মানব-সংসারের নিত্যবহ প্রেমচিন্তাও প্রকাশের কৈশোর ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

অপ্রকাশিত কবিতাবলী : চিত্তরঞ্জনের প্রকাশিত কয়েকটি গান ও কবিতাও বসুমতী সংস্করণের 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী'তে সঙ্কলিত হয়েছে। 'দেশবন্ধুর কবিতা', 'চিত্তরঞ্জনের শেষ কবিতা', 'বাঙ্গালীর সঙ্গীত', 'অবসাদ', 'নারায়ণ', 'সাধন সঙ্গীত' এবং ৪টি গান এই সঙ্কলনের সম্পদ।

বর্তমান আলোচনায় চিত্তরঞ্জনের কবি-মানসিকতার পরিচয়ই কেবল গ্রহণ করা হল। প্রথম গ্রন্থ 'মালঞ্চ' প্রকাশকালে কবির বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। বয়সের তারুণ্যে এ কাব্যের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। এখানে কবির যে ঈশ্বরবোধ প্রকাশিত তা গভীর সাধনদৃষ্টিতে স্বচ্ছ নয়। বুদ্ধিদীপ্ত মানবতাবোধে পরিশীলিত। যুক্তিগ্রাহ্য, কেবল বিশ্বাস সম্বল নয়। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মত অনেকটা। ঈশ্বর নিয়ে ভাবালুতার প্রশ্রয় তিনিও দেন নি। বৈষ্ণব, শৈব বা শাক্ত cult আশ্রয় করেও আত্মনিবেদন করার মত ভক্ত কবিও চিত্তরঞ্জন ছিলেন ।। জগৎ ও জীবনের প্রাত্যহিক জটিলতা ও যন্ত্রণার মধ্যে ভুলে থাকার জন্যে এক ধরণের ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টি তৈরী করে যাঁরা আধ্যাত্মিক উপদেশ বর্ষণ করেন চিত্তরঞ্জন সে-দলের ছিলেন না। কোন স্বপ্ন নয়, জীবনের সত্যই তাঁর নিকট বড়। তাই বেশ ঝাঁঝালো সুরেই বলেছেন—

ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন,
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ-শান্তি নিতেছে হরিয়া,
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!
... ...
... ...
আপনার হৃদয়ের ধূমরাশি দিয়া,
সত্য বলে পূজা করি অলীক স্বপন।
হায়! হায়! মিথ্যা কথা; ঈশ্বর। ঈশ্বর!
ঠেলে' ফেলি' জীবনের বিনীত নির্ভর,

ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে!
ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকি, ডাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে।—(মালঞ্চ : ঈশ্বর)

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় চিত্তরঞ্জনের কবিতার এই সুরের মধ্যে কোন ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের জ্বালা নেই অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে ধর্মভীরুতার অসারতা সম্পর্কে বলেছেন। মানুষের সমস্যাজর্জর জীবনে ঈশ্বরবন্দনায় কালাতিপাত করার পেছনে পলায়নপর, আত্মপ্রতারিত মানসিকতাই একমাত্র কারণ বলে মনে করেছেন তিনি। আত্মপ্রতারণার অলীক স্বপ্নজগৎ থেকে সুখ, দুঃখ, কামনা, বাসনায় মানব সংসারের প্রকৃত সত্য জানতে তাই আহ্বান করেন কবি :

ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি, ক্ষুধিত তৃষিত সদা যশ লালসায়,
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া ধরণীর কলতালি উৎসাহ অপার
নিমেষে নিশ্বাস ফেলি ভগবান্ স্মরি গুঞ্জরে শ্রবণে শত মধুপের প্রায়।
মানবের শতপাপ দাও দেখাইয়া! এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
ওহে সাধু! আমি জানি, অন্তর তোমার কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভাণ।

—(মালঞ্চ : ধার্মিক)

এই মর্ত্যপ্রীতির সঙ্গে রবীন্দ্র-মর্ত্যপ্রীতির সাদৃশ্য বা পার্থক্য সম্ভবত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুরই হল সীমা (মর্ত ও মানবজগৎ ও জীবন) ও অসীমের (অমর্ত্য, ও অরূপ, ঈশ্বরবোধ বা স্বর্গচিন্তা) দোলা। কোন সময় এই জগতের পার্থিব সীমা অদৃশ্য স্বর্গসুখ ও সীমা অপেক্ষা বড়, কোন সময় তা বড় নয় এইভাবেই তাঁর চিন্তা ঘড়ির দোলকের ন্যায় এপার ওপার যাত্রা করেছে এবং শেষপর্যন্ত কোনটিই বড় নয়, আবার কোনটিই ছোট নয়, জগৎ ও জগৎ-পিতা, সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের সম্পৃক্ত রূপ ও চিন্তাই আসল—এরূপ সিদ্ধান্তে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের কবিভাবনার সেরূপ গভীর জগৎ ও জীবনদর্শন লক্ষিত হয় না। কোমতের দর্শন, কুঁসোর চিন্তা বা নীৎশের ভাবনার ধারাও তিনি কতটা কী প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা শক্ত। তিনি যে-যুগের মানুষ সে-যুগের মূল ভাবনাই ছিল Humanitarianism বা মানবতাবাদ। চণ্ডীদাসের মানবতাবোধে যে আধ্যাত্মিকতার আবরণ ছিল উনবিংশ শতকের শেষ তিরিশে এসে আর তা ছিল না। সেখানে নীপাট মানুষের কথা, অকপট humanism-এর প্রশ্নই বড় ছিল। চিত্তরঞ্জন দু-দুবার বিলেত গিয়েছিলেন (১৮৯০ ও ১৯১১)। রবীন্দ্রনাথ বিলেত ঘুরে এসে 'বলাকা' লিখলেও তাঁর গতিবাদ সম্পর্কে যে ধারণা তা Burgson প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র ছিল এবং উপনিষদের চিন্তায় তা যে বিধৃত ছিল সে সম্বন্ধে এখন আর কোন দ্বিমত নেই। চিত্তরঞ্জনের এই মানবতার জয়গান সম্পর্কেও পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে কিছু বলার নেই। বরং বলা চলে চিত্তরঞ্জন ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল অমূল্য ব্যক্তিত্ব ও দুর্বার আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন তাঁদেরই পরোক্ষ প্রভাবে তাঁর এই মানসিকতা পুষ্ট হয়েছিল। স্যার আশুতোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির চারিত্রিক ঔদার্য চিত্তরঞ্জনকে অবিরত প্রেরণা দিয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের যে জীবনব্যাপী ত্যাগ ও দান তারও মূলে এই মানসিকতাই কাজ

করেছিল। তাঁর কাব্যের সুরে তাই তাঁর কর্মেরই প্রত্যয় ধ্বনিত।

প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও তাই চিত্তরঞ্জন একটু অধিক উত্তপ্ত। দেহাতীত, কল্পনাশ্রয়ী, আধ্যাত্মিকবোধে চিহ্নিত কোন প্রেমের ধারণা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

আকাশে যখন চাই শশী তারা কিছু নাই
শুধু জাগে ওই, ওই তোর নয়নের তারা।

বিরহেই কবির যন্ত্রণা। মিলনের আনন্দেই সুখ। এর মধ্যে কোন আপোষ আর নেই। কারণ খুব স্পষ্ট :

'আমার এ প্রেম শুধু রক্তের লালসা।'—(মালঞ্চ : লালসা)

'মালা'য় (১৯০৪) এতেও কবির দৃষ্টি ভঙ্গীর গভীরতা লক্ষিত হল। মালঞ্চের সেই দুরন্তপনা এখন অনেকটা স্থির, স্তিমিত। কিন্তু ভাব নিবিড়।

আমি দুঃখ জানি তাই হে প্রিয় আমার!
বুঝিয়াছি মর্মে মর্মে সুখের গৌরব!—
... ...
এ শুধু সুখের ছল! আমারে ছলিছে,
.....মম মন-বনে
আগ্রহে ফুটিতে চাহে শত পুষ্পদল!
দেখাতে পারি না তাহা!.....
তাই আঁখি-প্রান্তে মোর ভাসে অশ্রুজল।
তুমি মর্মে মর্ম আনি সব বুঝি নিও!—

তবে প্রেমের ভিত্তি কিন্তু সেই non-platonic! ইন্দ্রিয়াতীত অশরীরী সত্তায় প্রেমের মাধুর্য বর্ণনায় কবির বিশ্বাস নেই। নারী ও পুরুষের জগৎ ও জীবন প্রাণময় হয়ে ওঠে, উদ্বেল সানন্দে ভ'রে ওঠে। হৃদয়ের দুই মত্ত পাগল বিযুক্ত সামুদ্রিক অস্থিরতায় তখন দুর্দম হয়ে ওঠে। তখন আর কিছুতেই মনে হয় না।

Love, like the atmosphere
Of the sun's fine, filling the living world,
Burst from thee and illumined earth and Heaven
And the deep ocean and the sunless caves
And all that dwells within them.

—(Shelley : Hymn to Asia)

এক্ষেত্রে বরং ঢের বেশী মনে পড়ে

মিলন রজনী মোর আঁধার শ্রাবণ—
দুই দেহ তটে সে কি দুরন্ত প্লাবন!
অন্ধ হয় অন্ধকার, অন্ধ আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে

সে মুহূর্তে আমি যে মরণ অধিপ।
অথবা —দেহ করে আলিঙ্গন, তবে সে মধুর!
আঁখি তাই মুদে আসে—তৃপ্ত যবে প্রিয়ের পরশে
—মিলে যবে বাহুপাশে নিশ্বাসে নিশ্বাস।

চিত্তরঞ্জনের সাগর-চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে এমন কিছু কবিতা নিয়ে এবার তাঁর কাব্যের বিষয় পরিবর্তনের চেহারাটি দেখা যেতে পারে। সমুদ্র নিয়ে দেশী বিদেশী অনেক কবিই কবিতা লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধু তরঙ্গ' এবং 'দেওতার গ্রাস' এ প্রসঙ্গে মনে আসে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সমুদ্রবিষয়ক কবিতাগুলি প্রকৃতির রুদ্ররূপের বর্ণনায় মুখরিত নয়; এগুলির মধ্যে মানুষ, পৃথিবী ও সমুদ্রের আত্মিক সম্পর্কের কথাও বলা হয়নি কোথাও। কবির অনুভূতি এখানে নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং ভাবের নিবিড়তায় সে অনুভূতি অনেকটা মিষ্টিক হয়ে উঠেছে। যেমন সাগর সংগীতের ৩৯ সংখ্যক পদটি

এপার ওপার করি পারি না ত আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।

২৯ সংখ্যক পদে সমুদ্রের রূপ ও অবোধ্য ভাষার মধ্যে কবি নিজ সত্তার পরিপূর্ণ সমর্পণের কথা বলেছেন—

'তারপর কতবার জনমে জনমে
আমরা মিলেছি দোঁহে মরমে মরমে,
কতবার ছাড়াছাড়ি মিলেছি আবার
তুমি আর আমি আজ ওগো পারাবার!
তুমি ভেসে যাও সখা! অনন্তের পানে!—
আমি যে ভাসিছি শুধু তোমারি এ গানে!

মিষ্টিক আত্মসমর্পণের মধ্যে বস্তুত কবির অসীম প্রীতি বা অনন্তের প্রতি তীব্র আকর্ষণই প্রকাশিত হয়েছে। তাই সখা বা সঙ্গীরূপে সাগরের সঙ্গে কবির যে ভাব বিনিময় ঘটেছে তা অতি নিবিড়। নিতান্তই আত্মমুখীন। মগ্ন মনের চিন্তা। এই অনন্ত জিজ্ঞাসার জন্যে কবিতাগুলির মধ্যে এক ধরণের বিষাদময়তা সৃষ্টি হয়েছে। সামুদ্রিক গভীরতা, অনন্ত রহস্য, অসীম পারাবারের তুলনায় মানব জীবন কত ক্ষুদ্র। সসীম—এই চিন্তায় কবিমন বিষাদময়তায় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং আবার পরক্ষণেই সাগরের সেই বিশালতার মধ্যে কবি-মন আশ্রয় খুঁজেছে।—সমুদ্র নিয়ে এ ধরণের কবিবোধ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে খুব বেশী দেখা যায় না। চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবনের মধ্যে সাগর সঙ্গীতের কবিস্বভাবের মিল নেই। এখানে কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা মানব কল্যাণবোধের পরিচয় নেই। এ কবিতাগুলি নিতান্তই কবির সৃষ্টি; তারই অন্তর-বীণার ঝঙ্কার।

'অন্তর্যামী' (১৯১৪) কাব্যে এই মরচৈতন্য আরো স্পষ্ট। ৪২টি পদের এই কাব্যে ভগবানের প্রতি ভক্তের তীব্র আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। আকুলতার তীব্রতায় এবং তার প্রকাশ ভঙ্গিমায় কাব্যটি বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবভঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয় বলে অনেকে মনে করেছেন। অভিসার যাত্রার রীতিতে কয়েকটি পদ আছে। যেমন ১৬ সংখ্যক পদটি :

কেন হাসিতেছ তুমি নির্মম নিষ্ঠুর ?
অজানিত পথ কিগো অতই বন্ধুর ?
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে পার।
যেমন করেই হোক যেতে হবে মোর।
পথখানি যেথা থাক পাব আমি পার,
যেমন করেই হোক যাব আমি যাব।

শ্রবণে পূর্বরাগের সঞ্চার। ২০ সংখ্যক পদে সেই শ্রুতিপথে পূর্বরাগের চমটি দেখা যায়। "সব তার ছিঁড়ে গেছে। একখানি তার। প্রাণ মাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার।" ১৯ সংখ্যক পদেও মনের কোণে সেই বাঁশিই সুর তোলে : "মন-মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই! কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই।" তবে চিত্তরঞ্জনের 'অন্তর্যামী' রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্যামী'র (১৮৯৪ ?) মত বা 'জীবন দেবতা'র মত কোন অনুভূতি বা কল্পনা নয়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-কল্পনা বা কবি-কল্পনার প্রেরণাস্থল হিসাবে চিত্তরঞ্জন 'অন্তর্যামী' রচনা করেন নি। এ কাব্যে ভক্ত ও ভগবানের সহজ সম্পর্কের উপর রচিত। তবে কোন কোন পদে জয়ের সম্বন্ধটি অদ্বৈতবাদের সীমাস্পর্শী। যেমন ৩৪ সংখ্যক পদটি :

তোমার গান আমার গান এক হয়ে যাবে!
পথের মাঝে তরুলতা, সেই গানটি গাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বৈতাদ্বৈত বাদই প্রতিষ্ঠিত। ভক্তিবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য নয় তাই। চিত্তরঞ্জনের 'কিশোর কিশোরী' (১৯১৪) কাব্যখানি সম্পর্কে বলা হয়েছে ···'কিশোর কিশোরী'তে বৃন্দাবনের চিরকিশোর রাধাকৃষ্ণের নিত্যসীমাকে বহুযুগ বহুজন্ম বহু পৃথিবীর প্রাণের অম্লান বিকাশের মধ্যে চলে আসতে দেখেছেন। এ-কাব্যে মানবীয় সংস্কার নেই, অথচ ভাষার মাধুর্য অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব নয়।" এই উক্তিতে চিত্তরঞ্জনের উক্ত কাব্যখানির অর্থবোধে কিছুটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি হতে পারে। বৃন্দাবনের চিরকিশোর কিশোরী রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার শাশ্বত রূপ মানবের সংসারে ('পৃথিবীর প্রাণের অম্লান বিকাশের মধ্যে') লক্ষিত হলে 'মানবীয় সংস্কার' মুক্ত হতে পারে না। সম্ভবত তা অভিপ্রেতও নয়। বস্তুত অমল কৈশোরের আবেগ, রোমাঞ্চিত প্রেমানুভূতির এই শিহরণ সম্পূর্ণ বাস্তব সংসারেরই। তাই এই কাব্যের আস্বাদন বৈষ্ণব প্রেম লীলার পরিপ্রেক্ষিতে না করলেও ক্ষতি নেই অথবা সাধারণ নারী ও পুরুষের প্রেমচেতনায় যেমন রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলার ব্যাখ্যা ও পরিচয় গ্রহণ সম্ভব তেমনি এ কাব্যেও বিশুদ্ধ প্রেমের কাব্যে হিসাবেই বিচার করা যেতে পারে। বৈষ্ণবীয় ভঙ্গী বা রীতির উপরও তত জোর দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। খুঁজলে রূপ পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসারের চিত্র বহু প্রেমের কবিতা ও কাব্যের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। বৈষ্ণব পদের রচনাগত ব্যাকরণের হুবহু বা অতি সাদৃশ্য চিত্তরঞ্জনের কবিতায় নেই। ভাবের দিক থেকে বরং সে সাদৃশ্য দেখলে দেখা যেতে পারে ; এবং ভাবের এই সাধর্ম্য যে কোন প্রেমের কবিতারই স্বভাব হতে পারে, সুতরাং তাকে বৈষ্ণব চিন্তায় বা রীতিতে আস্বাদন করারও কারণ নেই। বৈষ্ণব কবিতার যে নিজস্ব ভাষা তারও ব্যবহার এই কবিতাগুলিতে নেই। তবে বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা হিসাবে কয়েকটি কবিতার উৎকর্ষ সন্দেহাতীত

অবশ্যই। যেমন—

কাছে কাছে নাই বা এলে—তফাৎ থেকে বাসব ভাল ;
দুটি প্রাণের আঁধার মাঝে প্রাণে প্রাণে পিদীম জ্বাল।
এপার থেকে গাইব গান, ওপার থেকে শুনবে ব'লে ;
মাঝের যত গণ্ডগোল ডুবিয়ে দেব গানের রোলে।

লাগবে যখন কোমল ক'রে তরুণ তব প্রাণের পারে,
—আশার মত—ফুলের মত—পরাণ ঘেরা অন্ধকারে,
ভয় পেয়ো না চম্‌কে উঠে, প্রাণের মাঝে চেয়ে থেক ;
ভেসে আসা প্রাণের নিধি প্রাণের প্রাণে বেঁধে রেখ।—

(কিশোর কিশোরী : তিনের কথা)

এ কাব্যের ভাষা অবশ্য স্খলিখিত, কিন্তু সর্বত্র নয়। শব্দ নির্বাচনে এই ভালমন্দের মিশ্রণ স্পষ্ট। মিল যোজনার ক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট। কিছু টুকরো উদাহরণ 'ভাটায় ফোটে যে ফুল | মোর ফুলে যে ফুটেছে | ফুলে ফুলে ফুলাকুল | ফুলে ফুলে ফুটেছে !" কতক জায়গায় একই শব্দের বারবার ব্যবহারে অনুপ্রাসের মাধুর্য ভাবহানির ফলে সস্তা বোধ হতে পারে। যেমন : 'আভাস' কবিতার ৭ সংখ্যক পদের দ্বিতীয় স্তবকে 'কত' শব্দটি ১৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। বা প্রথম স্তবকে 'এমন' শব্দটি ৫ বার, 'নাই' ৪ বার, 'দিন' ৩ বার বা

তুমি যে মধুর !
তুমি যে বঁধুর
তুমি যে মধুর মধু মাধুরী আমার। ইত্যাদি।

চিত্তরঞ্জনের অপ্রকাশিত কবিতা ও গানগুলির মোট সংখ্যা ১০টি। গানগুলির সবকটি নতুন রচিত নয়, ১৯০৬-এর 'সাধন-সঙ্গীত'টি শাক্তগীত। অন্যগুলি প্রেম ও বৈষ্ণব কীর্তন। 'অবসাদ' কবিতাটি মাথুর পর্যায়ের বিরহবোধে বিধৃত। বৈষ্ণব ভক্তিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 'চিত্তরঞ্জনের শেষ কবিতাটিরও বিচার চলে।—শ্রীকৃষ্ণের মোহনরূপের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। 'নারায়ণ' কবিতাটির মধ্যে ভেদ-অভেদ তত্ত্বের অবসান ঘটিয়ে ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈত স্বরূপই প্রকাশ করেছেন :

'তোমার মাঝারে হব না অভিন,
তোমা হ'তে যেন বহিশ্চির-দিন,
জলবুদ্‌বুদ জলে হলে লীন,
যে সুখ—সে সুখ চাহি না।'

শাক্ততত্ত্বের 'চিনি হতে চাই না আমি, চিনি খেতে চাই' পদটি স্বভাবতই মনে পড়ে।—আলোচ্য পর্যায়ের 'বাঙ্গালীর গীত' কবিতাটি বিশেষ কারণে মূল্যবান। এই একটিমাত্র কবিতা যার মধ্যে কবি বাঙ্গালী জাতের ঐতিহ্য ও বীরত্বের জয়গান করেছেন, জাতিকে স্বাধীনতার মুক্তি সংগ্রামে উঠে দাঁড়াতে প্রেরণা দিয়েছেন : সঁপিও না সর্ব আশা বিদেশী চরণে—

সত্যেরে সহায় কর জীবনে মরণে।
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস।

চিত্তরঞ্জনের কবিতাগুলির ভাষা ও অঙ্গরাগ সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমে কবিতাগুলির শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।—যে কোন রচনার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভাষার উপাদানই হল শব্দ। শব্দ নির্বাচনের মধ্যে লেখকের মানসিকতার পরিচয় থাকে লুকিয়ে। অনেক সময়েই দেখা যায় প্রসঙ্গ বা বিষয় অনুযায়ী লেখক শব্দ নির্বাচন করেন। অবশ্য নির্বাচিত শব্দের সুনিপুণ ব্যবহারেরও দরকার হয়। তার অভাবে রচনার মাধুর্য ও ঐশ্বর্য আহত হতে বাধ্য। চিত্তরঞ্জনের শব্দব্যবহার ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সে সময়ের কবিদের রচনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য তিনিও দেখাতে পারেন নি। স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহারে স্বপ্ন—স্বপন, জন্ম—জনম, মূর্তি—মুরতি, প্রাণ—পরাণ, শব্দ—শবদ, মর্ম—মরম, ত্রাসে—তরাসে, মগ্ন—মগন, বর্ষিল—বরষিল, মুগ্ধ—মুগধ। দেশী, বিদেশী, তদ্ভব ও তৎসম শব্দের নির্বিচার ব্যবহার :

(i) (আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে (iii) তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে, কি ব্যথা উঠছে বাজি
নয়নে হেরি অন্ধকার।
(ii) তাই নীরদ কুন্তলে নিম্ব রোপবীতে (iv) লাফায়ে ঝাঁপায়ে পড় পাতালে অম্বরে।
স্নিগ্ধ কৌমুদীবরণ নিতে
সদা—নিরখিছ চিত্তহারী।

কষ্টকর মিল :

(ক) থাকে আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ!
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন!
(খ) এস আমার মন বামে টিপি টিপি পাও!
চরণতলে প্রাণে প্রাণে কুহম ফুটাও!
(গ) একটুখানি সোহাগ দিও, দিও জ্বালাতন!
একটু খানি গরল দিও, হোক না কাঁটাবন।

ক্রিয়াপদের প্রাচীনতা : করেছিনু, চালিনু, গেয়েছিনু, ভরেছিনু, ছিলেন, চুমিয়া লও, বাজাহু রুধিয়া, সুধায়েছে, ইত্যাদি।

এই archaic ব্যবহার শব্দের ক্ষেত্রেও কম নয়! যেমন : মম, মোর, তব, প্রভৃতি সর্বনাম বাচক শব্দ। সম্বোধনসূচক 'হে', 'ওহে' 'ওগো'র ব্যবহারও লক্ষিত হয়। সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারও এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়। যথা : শৈশব—স্বপ্ন, তিমির—তরঙ্গ, সহস্র—সঙ্কল্প —ভরা তরুণ—জীবন, দুরন্ত অলস ভরা বিদ্রোহ অসীম, সৌন্দর্য—সঙ্গীত, অধর—চুম্বন, আনন্দ —সুরা, মরণ—গীতি, পরাণ—কমল, জীবন—কলম—বন।

লিঙ্গ অনুযায়ী বিশেষণ ব্যবহারের রীতিটিও চিত্তরঞ্জনের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে গ্রাহ্য হতে পারে। যেমন : ত্রস্তা তরিণী, করুণারূপিণী বনলতা, হে অপরিচিতা, শান্ত—রঙ্গিনী, স্বপনসঙ্গিনী।

কিছু বৈষ্ণবপদাবলীর শব্দের ব্যবহারও আছে : চল চল অঙ্গের লাবণি, আপনা পাসরি, নিরখিছ চিতহারী, জনম জনম ধ'রে | সকল মরম ভ'রে'।

রাবীন্দ্রিক শব্দের ব্যবহার : অন্তর্যামী, ছায়ালোক, মন-পথ-বাসী, এপার—ওপার, শব্দহীন মহাকাশ, ধূসর তরঙ্গ মাঝে নীরব সন্ধ্যা, নিদ্রাহীন নিশি, মোহন আঁধার, স্বপনসঙ্গিনী, অলস অঞ্চল গন্ধ সুরভি সমীর, মায়া মগ্ন লোক, ধূসর সন্ধ্যা, অশ্রু পারাবার, শব্দহীন সঙ্গীত, পরাণ ঘেরা অন্ধকারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গীতে :

থাক থাক আজ নয়। এত লোক মাঝে
যে গান সকলে শুনে সেই গান গাও।
এরাও সেজেছে আজ প্রমোদের সাজে
এদের হৃদয় লয়ে হাসাও নাচাও।
যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
গাব দুজনায়
দুজনে ভাসিয়া যাব অনন্ত হরষে!—(সাগর সঙ্গীত : ২৭)

আজ নহে, আজ নহে, সকলের কাছে
মিনতি আমার! আজি মোর কিছু নাহি।
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে তরিবারে চাহি—
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা।
(সুপ্রিয়ের প্রতি)

যে কথা শুনাতে ছিলে কহো সেই কথা,
আপন কাহিনী। শুনিয়া বিস্ময় লাগে,
নূতন বারতা পাই, নবদৃশ্য জাগে
বক্ষে মোর।'—(মালিনী : চতুর্থ দৃশ্য)

উভয়ের ছন্দরীতিটিও এক। ৮ | ৬I মাত্রা ভাগে অক্ষর বৃত্ত প্রকৃতিতে রচিত। কবি মানসিকতার এ মিল বা সাদৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত ছিলেন। উভয়ের মতামত নানা বিষয়ে এক রকম না হলেও কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে দেশবন্ধু রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের বাইরে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি বলেই মনে হয়! তাই আকৃতির দিক থেকে সাধারণত ত্রিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পয়ারের ব্যবহারই করেছেন। ৮ | ৬I মাত্রা ভাগে অক্ষর বৃত্ত প্রকৃতিতে চিত্তরঞ্জন পয়ারের প্রবহমানতাও সৃষ্টি করেছেন। ভাবকে পরবর্তী পংক্তিতে নিয়ে এসে অমিত্রাক্ষরের পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত মিল দিয়ে। পূর্বে উদ্ধৃত কবিতাংশ তারি উদাহরণ। এই ভঙ্গীতে এবং সাধারণ রীতিতে বেশ কয়েকটি সনেটও রচনা করেছেন। মালঞ্চের অন্তর্গত 'উপহার', 'রাণী' 'জাগরণ' ওফিলিয়া', 'ঋণী', স্বপ্ন, 'দিবসে', 'অহঙ্কার', আকাঙ্ক্ষা, 'ঈশ্বর', 'মৃত্যু', 'তৃষ্ণা', 'চিরদিন', 'সোহহং' কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি', 'ধার্মিক',

'অভিসার', 'সাক্ষী', 'বিদায়', 'প্রেমপরিহাস', 'রক্তগোলাপের প্রতি', 'ঊষা', 'কল্পনা', 'দুঃখ,' 'সুখ', ও 'দরিদ্র' মোট ২৭টি সনেট এবং 'প্রেমচতুষ্টয়'কে যদি চারটি পৃথক সনেটের একটি কবিতা ধরা যায় (বোধ হয় তা যায়, ভাবের ক্ষেত্রে ও রূপের স্বার্থে তাতে অসুবিধা ঘটায় না)। তাহ'লে ৩১টি সনেট। এই ৩১টি সনেট ব্যতীত 'মালা' কাব্যের 'মরণের সুখ' : 'উপহার', 'প্রেম', 'রাগ', 'মোছ আঁখি', 'বিদায়', 'বসন্তের শেষে' 'আপনার গান', 'তুমি ও আমি', এবং সাগর সঙ্গীতের ১১, ১২, ১৫, ২০, ২৭, ২৯, ৩০; ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ এবং ৩৯ সংখ্যক কবিতা সনেটের আকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে বিচার্য। অর্থাৎ মোট ৫২টি সনেট চিত্তরঞ্জন লিখেছিলেন। মালঞ্চের কবিভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি সনেটটিতে কবি রবীন্দ্রনাথের সনেটের প্রশংসা করে নিজের সনেট রচনার অক্ষমতা ও অভিলাষের কথা ব্যক্ত করেছেন। সনেটটিতে অষ্টক ও ষটকের বিভাগ নেই কিন্তু সেক্সপীয়রের সনেটের কায়দায় শেষ পংক্তিদ্বয়ে বক্তব্যের বিস্তার হঠাৎ গুটিয়ে এনেছেন। প্রথমে তাঁর কল্পনা ও বর্ণনা নভোচারীই। সনেটটির মিল বিন্যাস দেখানো হল।

এ নহে রবির লেখা সুন্দরী সনেট্,	ক
শারদ প্রভাত সিক্ত শুভ্র শেফালিকা :	খ
কিম্বা কবি! বাতায়নে মুগ্ধ জুলিয়েট।	ক
এ মোর হৃদয়জাত মলিন মালিকা	খ
পড়িয়া চরণে তব তুলে দেখ কবি।	গ
তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি,	ঘ
সুখভরা শান্তিভরা স্বপ্নভরা সাধ,	গ
ব্যঙ্গভরা বাক্য আর রঙ্গভরা হাসি।	ঘ
আরো ভালবাসি আমি প্রিয়ারে তোমার।	ঙ
কত না কবিতা তাহার অধরে লাগিয়া,	চ
অন্নপানে রাঙা মুখ হইতে যাহার	ঙ
তোমার অধর কবি লইতে রাঙ্গিয়া।	চ
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট্	ক
আমার আগ্রহ ভরা ভিখারী সনেট্।	ক

বাকী ৫০টি কবিতার মিল বিন্যাস নিম্নরূপ :

পংক্তি মিল	কাব্য	কবিতার নাম/সংখ্যা
কথ কথ গঘ গঘ ঙক ঙক চচ	মালঞ্চ	উপহার
কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ ছছ	,,	রাণী
কথ কথ কথ কথ গঘ গঘ ঙচ	,,	ওফিলিয়া
কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ ছছ	,,	ঋণী
কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ ছছ	,,	স্বপ্ন
কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ চচ	,,	অহঙ্কার

কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ ছছ	মালঞ্চ			দিবসে
কথ কথ	গঘ ঙঘ	চছ চছ	জ্ঞজ…মালঞ্চ :	আকাঙ্খা
কথ কথ	গঘ গঘ	ঙচ ঙচ	ছছ … " :	প্রেমচতুষ্টয়/১
"	"	"	" … " :	" / ২
"	"	"	" … " :	" / ৩
"	"	"	" … " :	" / ৪
"	গথ গথ	ঘঙ ঘঙ	ঘঙ … " :	ঈশ্বর
"	গঘ গঘ	ঙঘ ঙঘ	গগ … " :	সুখ
"	"	ঙচ ঙচ	কক … " :	তৃষা
"	থগ থগ	ঘথ ঘথ	ঙঙ … " :	চিরদিন
"	গথ গথ	ঘঙ ঘঙ	ঙঙ … " :	সোহহং
"	গঘ গঘ	ঙথ ঙথ	চচ … " :	ধার্মিক
"	"	ঙচ ঙচ	ছছ … " :	অতিসার
"	"	"	" … " :	সাক্ষী
"	"	"	" … " :	প্রেমপরিহাস
"	"	"	" … " :	ঊষা
"	"	"	" … " :	কল্পনা
"	"	ঙগ ঙগ	গগ … " :	বিদায়
"	গথ গথ	ঘঙ ঘঙ	চচ … " :	রক্তগোলাপের প্রতি
"	গঘ গঘ	ঙঘ ঙঘ	ঘঘ … " :	দুঃখ
"	"	ঙচ ঙচ	ছছ … " :	সুখ
"	"	"	" … " :	দরিদ্র

'মালা'কাব্যের সনেট ন'টির মিল বিন্যাস যথাক্রমে কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ চচ, কক থথ কক গগ ঘঘ কক ঙঙ, কথকথ গঘগঘ ঙচঙচ ছছ, কক থথ গগ ঘঘ ঙঙ চচ কক, কথকথ গঘগঘ ঙচঙচ ছছ, কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ থথ, কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ ছছ, শেষ দুটির মিল বিন্যাসও অদ্ভুরূপ। 'সাগর সঙ্গীতে'র অন্তর্গত ১২টি সঙ্গীত সনেটের আকৃতিতে রচিত। এগুলির মিল বিন্যাস নিম্নরূপ :

কথ কথ গগ ঘঘ ঙঙ চচ ছছ = ১১ সংখ্যক সঙ্গীত।
কথ কথ গঘ গঘ ঙঙ চচ ছছ = ১২ ,, ,,
কক থথ গগ ঘঘ ঙঙ চচ ছছ = ১৫ ,, ,,
কথ কথ গঘ গঘ ঙথ ঙথ চচ = ২০ ,, ,,
কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ গগ = ২৭ ,, ,,
কক থথ গগ ঘঘ থথ ঙঙ গগ = ২৯ ,, ,,
কক থথ গগ ঘঘ ঙচ ঙচ ছছ = ৩০ ,, ,,

কথ কথ গথ গথ ঘগ ঘগ ঙঙ = ৩১ „ „
কক থথ গগ ঘঘ ঙঙ চচ ছছ = ৩৩ „ „
কক থথ গগ ঘঘ ঙঙ চচ ছছ = ৩৪ „ „
„ „ „ „ „ „ থথ = ৩৫ „ „
„ „ কক গগ ঘঘ ঙঙ কক = ৩৯ „ „

সবকটি সনেটই অক্ষরবৃত্ত প্রকৃতির ছন্দে রচিত; তবে সাগর সঙ্গীতের সনেটগুলির পংক্তি বিভাগের মাত্রা ৮ | ৬ I নয়, ৮ | ৮ I | বিশুদ্ধ শেক্সপীরীয় মিল বিন্যাসে (কথ কথ গঘ গঘ ঙচ ঙচ ছছ)' দেশবন্ধু ১৯টি সনেট লিখেছেন। বাকী শেক্সপীয়ারের আদর্শেরই সামান্য রূপভেদ এবং কিছু পেত্রার্কীয়ান রূপভেদে। 'সাগর সঙ্গীতে'র ক্ষেত্রে কবির স্বাধীনতাই বড়। চিত্তরঞ্জনের অধিকাংশ কবিতাই ছন্দ-প্রকৃতির দিক থেকে অক্ষরবৃত্তে রচিত। তবে দু'একটি কবিতা অন্য ছন্দ-প্রকৃতিতেও রচিত হয়েছে। যেমন স্বরবৃত্তে রচিত :

সেই যে শিরে | মোহন চূড়া, I
সেই ত হাতে | মোহন বাঁশী, I
সেই মূরতি | হের বো বলে I
প রাণ বঁড়ু | অভিলাষী ; II

(৪ | ৪ I, ৪ | ৪ I, ৪ | ৪ I ৪ II) I—(অপ্রকাশিত কবিতা : ১) মাত্রাবৃত্ত প্রকৃতিতেও চিত্তরঞ্জনের কবিতা রচিত হয়েছে। 'সাগর সঙ্গীতে'র ২৭ সংখ্যক কবিতাটি এ প্রসঙ্গে দেখা যেতে পারে।

‖ ‖ ‖ ‖ | ।। ‖ ।।
থাক থাক আজ নয়। এত লোক-মাঝে |৮।৬।
। ‖ ।।। ।। | ‖ ‖ ‖
যে গান সকলে শুনে সেই গান গাও I ৮।৬।
।। । ।।। ‖ | ।। ‖ ।।
এ রা ত সেজেছে আজ প্রমোদের সাজে | ৮।৬।
।‖ ।‖ ।। | । ‖ । ‖
এদের হৃদয় লয়ে হাসাও নাচাও। II ৮।৬II

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : চলতি ভাষার ক্রিয়াপদ ও অব্যয় ব্যবহার করে কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিও চিত্তরঞ্জনের রচনায় লক্ষিত হয়। দু'একটি টুকরো দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। 'উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্নপটে আঁকা', 'সব তার ছিড়ে গেছে', 'এস আমার প্রাণের মালা', জীবনের যত সুখ শেষ হয়ে গেছে', | বাক্‌ধর্মী কবিতাংশেরও পরিচয় মেলে : যথা—

"তুমি কি আভাস পেলে পূজার গানের ?
গন্ধ পেয়েছিলে বুঝি পূজার ধূপের ?
তাই ছোটাছুটি ক'রে চ'লে এসেছিলে
আকুল সন্ধ্যায়,—"

'ছন্দোবন্ধে'র দিক থেকে অবশ্য চিত্তরঞ্জনের কাব্যে বিশেষ নূতনত্ব নেই। একপদী, দ্বিপদী ও ত্রিপদী,—সাধারণত এই তিন রীতির ছন্দোবন্ধেই তিনি কবিতাগুলি লিখেছেন। যেমন—একপদী ; (৮ মাত্রায়)।

মরণের পারে পারে একসঙ্গে একেবারে
এমন মধুর করে এমন পরাণ ভরে !

দ্বিপদী— এ তনুর প্রতি অণু | তৃষিত লোলুপ, |
এ প্রাণের পিপাসায় | কোথা তব রূপ ! I (৮ | ৬ I মাত্রা)।

ত্রিপদী— সৃষ্টির নিগড় গড়ি | চরণে পরিয়া আমি |
পূর্ণ পরাধীন ; I
অনন্ত ক্ষমতা নাই |, অপার অনন্ত দুঃখ |
সা'ব চিরদিন। I

৮ | ৮ | ৬I মাত্রাভাগে ত্রিপদী বন্ধে অক্ষরবৃত্ত প্রকৃতিতে রচিত। দেশবন্ধুর কবিতা সালঙ্কৃত। কয়েকটি পরিচিত অলঙ্কারের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। যথা—

উপমা : (i) ওই যে কার গীতধ্বনি জয়ধ্বনির মত।
(ii) সহসা স্বপন সম সুন্দর নির্মল,
ভাসিল আঁধার-মাঝে-মানস-মুরতি ;
(iii) বর্ণহীন শুভ্র শোভা ম্লান মরতের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন প্রভাত-শিশির।
অনন্ত-সৌন্দর্য-ভরা কবি-হৃদয়ের
ওফিলিয়া ! তুমি যেন স্বপন-নিশির !
রূপক : মন-পথের পথিক হয়ে পথে ভাসিলাম।
উৎপ্রেক্ষা : সুর হারানো গানের মত ভাসছি অবিরত।
বিরোধাভাস : সুখের মত দুঃখ আজ, দুঃখের মত সুখ।
সমাসোক্তি : আকাশ চাহিয়া আছে অবাক্ নয়ন তার।
ওগো সিন্ধু ! অন্ধ তুমি কোন্ ছায়ালোক জুড়ে
গাহিছ করুণ গীতি বিধায় জড়িত সুরে ?
নিশ্চয় : (i) এ নহে স্বপন কুঞ্জে কুসুমের হার,
এ নহে কোমল যন্ত্রে মধুর ঝঙ্কার।
এ যে গো নির্দয় ক্ষত্র।
(ii) সুনীল নয়ন তব নহে গো আকাশ,
প্রাণ-পাখী আর নাহি ধায় নিরুদ্দেশ ;
ও তনু-পরশ নহে বসন্ত বাতাস,
বাসনার স্বর্গ নহে তব কৃষ্ণ কেশ।

স্মরণ : চন্দ্রমা-চুম্বিত শোভা সুনীল আকাশে,
তালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল ;
আর্দ্র বায়ু বহে' যায় আর মনে আসে
সেই আঁখি, সেই হাসি, সেই অশ্রুজল।

চিত্তরঞ্জনের কবিতার এই অঙ্গরাগের সঙ্গে ভাবের নিবিড়তার যথার্থ সঙ্গম হয়তো সর্বত্র লক্ষিত হয় না তবু মাঝে মাঝে তাঁর কবিমানসিকতার শিল্পরুচি ও সূক্ষ্ম অনুভব শক্তির দার্ঢ্য পরিচয়ও দুর্লভ নয়। বস্তুত অল্প হলেও এরূপ কবিতার ক্ষেত্রেই চিত্তরঞ্জনের কবিমনের যাথার্থ্য বিচার্য। একটি মাত্র উদাহরণ তুলেই এ বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করা যাবে। কবিতাটির ভাব, চিত্রকল্প, ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দ চয়ন ও ব্যবহার এবং বস্তু বিগলিত রস সৌন্দর্য সৃষ্টি বা বিভাবিত আনন্দবোধ রচনার নৈপুণ্য সবই আছে। একটি সার্থক কবিতা বলতে যা যা বোঝায় 'মালঞ্চে'র অন্তর্গত নিশীথে কবিতাটি তাতেই রচিত। দেখা যাক কবিতাটি :

নূপুর খুলিয়া লও !
যদি এই রজনীর অন্ধকারে বাজে—
আমাদের দু'জনের কলঙ্কের কথা ;
যদি এই অর্ধসুপ্ত সংসারের মাঝে
বাতাসে প্রকাশে অন্ধ অন্তরের ব্যথা,—
মর্ম-কাতরতা !
কৌতূহল-পরবশ বিশ্বের নয়নে
এ প্রেম সুন্দর যদি ধরা প'ড়ে যায় ;
যদি নব-প্রস্ফুটিত এ প্রেম-পবনে
দু'জনার সর্বসুখ অন্তরের ছায়
শুষ্ক হয়ে যায় ?

এক নির্জন নিশীথিনীর বুকে কান্তমিলনে অভিসারিকার পদসঞ্চারের যে গোপন সুরভির কথা এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে তা লিরিক কবির তন্ময়তায় ভরা, অতি গভীর, সরস সঘন। এ প্রেমের নিপাট নিবিড়তা কেবল দুটি অর্গলমুক্ত হৃদয়ের সমুদ্র-রহস্য। বিশ্ব সে রহস্যের আলোয় কোনক্রমে জেগে গেলেই এ গোপন গন্ধ প্রেমের অসীম সৌন্দর্য ভঙ্গে খান খান হয়ে যায়। তাই এত সাবধানতা, 'নূপুর খুলিয়া লও।' 'বাতাসে প্রকাশে অন্ধ-অন্তরের ব্যথা', 'অর্ধসুপ্ত সংসার', 'রজনীর অন্ধকার' প্রভৃতি শব্দ নির্বাচনে ও প্রয়োগের সার্থকতার 'রোমান্টিক সাবজেক্টিভিটি'র প্রকাশ হয়েছে। ৩টি অর্দ্ধ ছন্দপংক্তির ব্যবহারে অব্যক্ত প্রেমের গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্ত্যে ৮।৬ I মাত্রা ভাগে বিপদী পয়ার বন্ধে অক্ষরবৃত্ত প্রকৃতির ছন্দে কবিতাটির কাব্যশ্রী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সমগ্র চিত্রকল্পটি কথার স্বল্পতম রেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। নূপুর খুলে নেওয়ার কারণগুলি মূল রসের আলম্বন বিভাবের কাজ করেছে এবং বিভাবিত সৌন্দর্যবোধেই কবিতাটির সার্থকতা প্রকাশ পেয়েছে।

চিত্তরঞ্জনের কবি প্রতিভা সম্পর্কে এত কথা বলার কারণ তার মানসিকতার একটি উল্লেখযোগ্য

সম্ভাবনাময় দিকের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সেই বাগ্মী পুরুষ, তেজস্বী, দানবীর, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বীরেরও যে একটি পেলব, রোমান্টিক, মিষ্টিক তন্ময় কবিপ্রাণ ছিল এবং প্রকৃত অর্থে যদি তার কর্ষণ হত তাহলে যে সোনার ফসলই তাতে ফলত সে সম্বন্ধে সম্ভবত আর দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে এ প্রসঙ্গে আবারো স্মরণ করা উচিত যে চিত্তরঞ্জন কবিতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের অতি প্রখর প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেমন উদ্ধৃত কবিতাটির পাশে রবীন্দ্রনাথের—

'আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিজল ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কি লজ্জায় ॥'

কিন্তু তা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনের কবি-ভাব ও ভাবনা ছিল। এক অতি উজ্জ্বল প্রতিভার সংস্পর্শে এসে সে প্রতিভার দ্বারা চিহ্নিত হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু সে চিহ্নকে নিজের মানসিকতায় পরিস্রুত রূপে আবার ফুটিয়ে তোলাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের কবি তো কম ছিলেন না ; এমনভাবে নিজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তা আবার নতুন করে ফুটিয়ে তুলতে কজনা পেরেছিলেন ? তাছাড়া চিত্তরঞ্জন যে কবিতার সাধক ছিলেন না, আগুন জ্বালানো জাতীয় আন্দোলনের নেতা ছিলেন, সে কথা ভুললে চলবে না। বলা চলে কবিতা তাঁর অসতর্ক মানসিকতার ফসল। সহৃদয় হৃদয়বানের নিকটেই তার মূল্য।

১ ভবতোষ দত্ত, কাব্যবাণী : চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯৬৬, ২৭১।

বাংলার লোকশিল্প

আশুনাথ মুখোপাধ্যায়

একথা বোধহয় অনেকেরই অজানা নয় যে বাংলাদেশে কিছুদিন আগে পর্যন্ত লোকশিল্পের প্রতি কারুর বড় একটা দৃষ্টি ছিল না। গত শতাব্দীর শুরু থেকে এদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহের আন্দোলন ও প্রচেষ্টা পুরোদমে চললেও লোকশিল্প প্রসঙ্গে চিন্তা করা হয় নি। এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বর্গতঃ দীনেশচন্দ্র সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, ভাববেদনা ও আদর্শ প্রকাশের এই নগণ্য মাধ্যমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণের ভার নিয়েছিলেন এই তিনজন মনীষী। এঁদের আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় লোকশিল্প জাতে উঠলো। শুরু হলো লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করা—আশুতোষ সংগ্রহশালা, গুরুসদয় মিউজিয়াম, ভারতীয় সংগ্রহালয়, সরকারী কারিগরী ও শিল্প মিউজিয়াম-এ কাঁথা পট, পাটাচিত্র, চিত্রিত ঘট, মাটির পুতুল প্রভৃতি সযত্নে সংরক্ষিত হলো।

বর্তমানে লোকশিল্পের কদর বেড়েছে—অন্ততঃ শিক্ষিত মহলে এর মূল্যমান সম্বন্ধে বোধহয় কারুর সন্দেহ নেই। যদিও বাংলাদেশে শিল্পীর সজাতব্যবসা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হলো শিল্পের অবলুপ্তি। এখন আর গ্রামের মেলাতে মাটির বা কাঠের পুতুল বড় একটা চোখে পড়ে না, দেখা যায় না গ্রামবাংলায় শরৎকালের সোনালী রুদ্দুরে পটোদের পট খেলানো। সরকারী প্রচেষ্টায় কিছু কিছু সনাতন ও কারিগরী শিল্পকে বাঁচাবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফলাফল যে খুব একটা আশাপ্রদ হয়েছে একথা বলা যায় না। মূলতঃ বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ও অর্থ নৈতক ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সনাতন শিল্পধারার স্রোতও থেমে গেছে।

বাংলার লোকশিল্পের ভিত্তি ছিল বংশানুক্রমিক জাতিগত ব্যবসা। সূত্রধর, কুম্ভকার, কর্মকার, চিত্রকর, মালাকর প্রভৃতি বংশপরম্পরায় জাতিগত পেশাতে নিয়োজিত হয়ে শিল্পের গতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। অন্যান্য দেশে লোকশিল্পের যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করার নানা চেষ্টা হয়েছে। একজন খ্যাতনামা জাপানী শিল্পসমালোচকের মতে সাধারণ মানুষের সবরকম সৃষ্টিকেই লোকশিল্প বলা যায়। সাধারণ মানুষ অর্থে তিনি ব্যক্তিশিল্পীর পাশাপাশি অগণিত নাম না জানা শিল্পীর কথাই ভেবেছেন। পৃথিবীর অন্য দেশে লোকশিল্পের এই ব্যাখ্যা কার্যকরী হলেও বাংলাদেশে কার্যকরী কিনা ভেবে দেখতে হয়। অগণিত অজানা শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিচিত না হলেও জাতিগতভাবে অজানা নয়। অনাদিকাল থেকে প্রবহমান শিল্পের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশের এই শ্রেণীভুক্ত পেশাদার কারিগররা। ফলে শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে সনাতন ও বংশানুক্রমিক। কাজেই এদেশের শিল্পীর সৃষ্টিকে সেই অর্থেই দেখতে হবে। যেখানেই এই সনাতন ধারা বাধাপ্রাপ্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, লোকশিল্পের গতিরুদ্ধ হয়েছে সেখানে। অথবা সাময়িকভাবে অভিজাততন্ত্রের প্রয়োজনে লেগেছে।

সুখের কথা বাংলার লোকশিল্প এর থেকে মুক্ত। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলেছেন, এই শিল্প

গ্রাম বাংলার সরল মানুষের, যারা অনাদিকাল থেকে এক গ্রামীণ গণতন্ত্রের আওতায় বসবাস করে আসছে। কোন পরাক্রম রাজকীয় শক্তি কিংবা পুরোহিত গোষ্টি একে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারেনি। যখনই কোন বাইরের হাওয়া বয়েছে এই গ্রামীণ সংস্কৃতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে রূপে রঙে রসে আপন সত্তার মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছে।

বাস্তবিক, দীর্ঘকাল ধরে এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণের ফলে গড়ে উঠেছে সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস যা সমাজের গতিকে অগ্রমুখী করে রেখেছে। নূতন নূতন ধারণা সংযোজনের ফলে চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণার প্রসার লাভ ঘটায় বাঙ্গালীর সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন একদিকে যেমন হয়েছে দৃঢ়, অন্যদিকে তেমনি তার ব্যাপ্তি বেড়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে সহ অবস্থান করেছে। বৈদিক সভ্যতার প্রভাব ছাড়াও বাঙ্গালীর ধর্ম সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে অনার্য ধ্যান ধারণা পূজো আচারবিধি অনুপ্রবেশ করেছে। তাছাড়া পঞ্চোপাসকদের উদ্ভবের ফলে যেমন শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি, সূর্য উপাসনার নব নব দিকে উন্মোচন হয়েছে—অন্যদিকে বাঙ্গালীর জীবনে বৌদ্ধধর্মও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। বিশেষ করে সমাজের নীচু শ্রেণীর উপর। তান্ত্রিকদের কঠোর নিয়ম বিধির কল্যাণে এক সময় এদেশে শক্তিপূজোর বহুল ব্যবস্থা ছিল। তন্ত্রযানের আওতায় হিন্দু বৌদ্ধরা সমানভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। আবার ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে যখন বৈষ্ণব ধর্ম যারা বাংলাদেশকে তোলপাড় করেছিল তখনও তা বাঙ্গালীর হৃদয়কে কম আলোড়িত করেনি। বৈষ্ণব গীতি কবিতার রসে আপ্লুত হয়েছিল মানুষের জীবন। আর এসব কিছুর প্রতিফলন পড়েছিল লোকশিল্পের উপর।

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানও বঙ্গ সংস্কৃতির বিভিন্নমুখী প্রকাশের পরিপূরক। নদী বিধৌত এই সমতলভূমি মানব সভ্যতার অতি প্রত্যুষ থেকে প্রকৃতির অফুরন্ত দানে ঐশ্বর্যশালিনী। বৃষ্টি আধিক্য ও সাময়িক বন্যায় বাহিত পলিমাটি এদেশের মাটিকে একদিকে যেমন করেছে উর্বরা, অন্যদিকে তার নমনীয়গুণে গড়ে উঠেছে হাঁড়িকুড়ি কলসী খেলনাপুতুল ইত্যাদি। মানুষের জীবন প্রকৃতির প্রাচুর্যে হয়ে উঠেছিল সহজ। জীবন সংগ্রাম সহজ হওয়াই এদেশের অধিবাসীদের ছিল প্রচুর অবকাশ। আর এই অবকাশের ফলে গড়ে উঠেছে সার্বিক ক্ষেত্রে লোক সংস্কৃতির সুষ্ঠু ও সাবলীল অভিব্যক্তি। কৃষিভিত্তিক সমাজ স্বভাবতই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উৎসগুলিকে শুধুমাত্র পূজো করতো তায় নয় তাকে কেন্দ্র করে সারা বৎসর উৎসব লেগে থাকতো। বৃষ্টি, নদী, গাছ, বসুন্ধরা প্রভৃতির আরাধনা যেমন মানুষের প্রাচুর্যের অনুকূল ছিল, অন্যদিকে অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচবার আতি নিয়ে সৃষ্টি হল অসংখ্য ছোটখাট দেবদেবী। শীতলা, ষষ্ঠী, মনসা প্রভৃতির কল্পনা কারুই ক্ষান্ত রইলো না, প্রয়োজন বোধে এদের মানুষের রূপে সৃষ্টি করা হল।

বৃষ্টিপাতের আধিক্যহেতু গাছপালার পরিমাণও খুব কম ছিল না। বাঁশ বেত ও অন্যান্য উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মাত বলে অতি প্রাচীনকাল থেকে লোকে নানারকম কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। এর সাহায্যে যেমন দৈনন্দিন জীবনের নানা উপকরণ তৈরী করতো, অন্যদিকে সূক্ষ্ম চারুশিল্প, যেমন ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতি প্রকাশের কাজেও কম ব্যবহার হতো না। আবার নদ নদী ভরা বাংলাদেশে নৌকা তৈরী মাছ ধরা ইত্যাদি নিয়েও উৎসবের অন্ত ছিল না।

এই বিশেষ শিল্পে নিযুক্ত কারিগররা ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়, সাগর যাত্রা বা নদী পার নিয়ে হতো নানা উৎসব অনুষ্ঠান আর দেব-দেবীর আরাধনা। সারি, ভাটিয়ালী, পূর্ববাংলার লোকগীতি ছিল এসবের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

স্বচ্ছন্দ জীবন, প্রচুর অবকাশ ও সহজ যোগাযোগের ফলে গড়ে উঠেছিল উন্নত ধরণের ব্যবসাবাণিজ্য। হেমন্তে নূতন শস্য ঘরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শুরু হতো মেলার মরশুম। সোমবছরের বেচা-কেনার ক্ষেত্র ছিল এইসব মেলা, চলতো ব্যবসাবাণিজ্য, লেনদেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ পণ্য নিয়ে আসতো, কেনা-বেচার সঙ্গে সঙ্গে হতো মানুষের চিন্তাধারণার আদান প্রদান। চলতো উৎসব আমোদ প্রমোদ লোকরঞ্জনের বিভিন্ন মাধ্যম। আর সেই সঙ্গে দেখা যেতো লোকশিল্পের নানা উপকরণ বস্তুর প্রদর্শন ও ক্রয়-বিক্রয়। খেলনা, পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, গৃহস্থালীর অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তু—শিল্পীর সারা বৎসরের পরিশ্রম ও নিষ্ঠা সাগ্রহ সমাদর পেত এক মাসের গ্রামীণ মেলাগুলোতে।

এ গেল বাংলার লোকশিল্পের পটভূমির একদিক। অন্যদিকে দেখা যায় ধর্মীয় আচার রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। মানব সভ্যতার কোন এক সময়ে যখন মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন এত দৃঢ় হয়নি, যখন মানুষ ছিল একান্তভাবে অসহায়, সেই সময় আধিদৈবিক আধিভৌতিক চিন্তায় মূলতঃ সে পরিচালিত হত। যা কিছু থেকে উপকার পেত কিংবা ভয় বা ত্রাসের সঞ্চার হতো, তাকেই সে নানান উপকরণ উৎসর্গ করে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো। কিংবা তার প্রতিমূর্তি বা ছবি এঁকে আপন বশে আনার প্রয়াস পেত। কালক্রমে এই আধিদৈবিক আধিভৌতিক চিন্তা মানুষের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে সমাজবদ্ধ জীবনে এসে প্রভাব বিস্তার করলো। আচারবিধির প্রয়োজনে সৃষ্টি হল মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ মনসাঘট, লক্ষীসরা, ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মীয় প্রয়োজন মেটাতে এগুলি তৈরী হলেও শিল্প হিসেবে এ সবের মূল্য কম ছিল না। মূলতঃ বাঙ্গালীর আচার অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক ও পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় মেয়েদের ব্রত ও স্ত্রী-আচার পালনের মধ্যে দিয়ে। ব্রত এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে বয়েস নির্বিশেষে অনুষ্ঠিত হত। এক বা একাধিক মেয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করতো উপবাস ও নানা আচার উপকরণের মাধ্যমে। ছেলেমেয়ে স্বামীর কল্যাণ থেকে শুরু করে গ্রামের সার্বিক মঙ্গল কামনা ছিল এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। চন্দ্র সূর্য্য তারা, বহুধাগাছ, নদনদী, ষষ্ঠী শীতলা মনসা প্রভৃতি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তুষ্ট করে লক্ষ্য বস্তুকে পাওয়ার প্রচেষ্টায় ব্রত পালন করা হতো। সরল অনাড়ম্বর বিচিত্র আলপনা সহকারে নিত্যগৃহস্থালী কাজের মধ্যে দিয়েই চলতো ব্রত উদ্‌যাপন। সামান্য কয়েকটি রেখায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রতের অন্তর্নিহিত ভাবটি অতি সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতো বাংলার নিরক্ষর মেয়েরা, কখনও-সখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে অপটু হাতে গড়ে তুলতো মাটির পুতুল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলার ব্রত' নিবন্ধে বলেছেন, প্রথম মনের মধ্যে ইচ্ছার সঞ্চার এবং পরিশেষে মন্ত্রের মাধ্যমে হত তার প্রকাশ। প্রথম ইচ্ছা, পরে রূপ সৃষ্টি তারপর মন্ত্রস্ফূরণ এবং সর্বশেষে ব্রতকথা বা কথকতা এই নিয়ে সম্পূর্ণ হত ব্রত। উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন ব্রতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন তারাব্রত, কুমারীব্রত, শিবব্রত, ষষ্ঠীব্রত, সুভোচনীব্রত ইত্যাদি—প্রতিটি ব্রতের ছিল ভিন্ন ভিন্ন আলপনা ও আচার অনুষ্ঠান। যেমন তারাব্রতে 'হাতে

পো ফাঁকে পো' মাতৃদেবীর আলপনা কিংবা সুভোচনীব্রতে এক ঝাঁক উড়ন্ত হাঁস এঁকে অন্তর্নিহিত ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হত। অপরূপ রেখায় ফুটে উঠতো রূপকটি, রূপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো ভাব। সরস অথচ তত্ত্ববোধক-বাংলার লোকশিল্পের সনাতন ধারাটি এইভাবে নিজস্ব গতি বজায় রেখেছিল।

লোকশিল্পের অন্তর্নিহিত রূপক বা প্রতীক কোন সনাতন কাল থেকে চলে আসছে আজও তার কোন যথার্থ সময় নির্ধারণ করা হয়নি। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলেছেন বর্তমান শিল্পবস্তুতে কিছু কিছু প্রতীক চিহ্ন পাওয়া যায় যা দেখে অনায়াসে বলা যায় বাংলার লোকশিল্পের ধারা প্রাক্-আর্য সময় থেকে চলে আসছে। কুমারস্বামীর মতে বর্তমান বাঙালীর লোকশিল্প পাঁচ হাজার বৎসরের শিল্পের উত্তরাধিকারসত্ব দাবী করতে পারে। পোড়া মাটির মূর্তি ও পুতুলের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ক্ল্যাম্‌রিস বলেছেন ভারতে দুই ধরণের পুতুল পাওয়া যায়। প্রথম সময়োচিত এবং অন্যটি কালোত্তীর্ণ। সময়োচিত পুতুলগুলির মধ্যে সমকালীন কালের রূপবৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট ছাপ দেখা যায় এবং এগুলিকে এক একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু অন্যধরণের মূর্তি সময়োচিত পুতুলের পাশাপাশি পাওয়া যায় এবং গঠনবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এগুলির সঙ্গে প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতার পোড়ামাটির পুতুলের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখনও বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে এই ধরণের পুতুল পাওয়া যায়।

এই কালউত্তীর্ণ পুতুল ও মূর্তি মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন ষষ্ঠীর মূর্তি কিংবা মা ও ছেলে কিংবা ঘোড়া ও ঘট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার বস্তু, আবার যখন ধর্মীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন সেগুলি নতুন সংজ্ঞা পেয়ে পবিত্র হয়ে উঠেছে। তেমনি অন্যান্য বস্তু বা চিত্র যা একস্থানে কোন অর্থবহ হয় না, অন্যস্থানে সেগুলি গূঢ় অর্থবোধক হয়ে উঠে। আবার ব্রত উদ্‌যাপনে মেয়েরা যে আলপনা দেয় সেগুলির পূর্ণ পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। কিন্তু বিয়ের পিঁড়ির আলপনা অলংকরণ ছাড়া অন্য কোন অর্থের সূচনা করে না। যে মুহূর্তে ব্রতকথা শেষ হয় আলপনাও তার পবিত্রতা হারায়। কাজেই সবক্ষেত্রেই এই প্রতীক বা রূপক স্পষ্ট হয়ে উঠে না। বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্রত ও পূজা-আচারের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন আলপনা দেওয়া হয় কুমারীব্রত, তারাব্রত, শিবব্রত, লক্ষীব্রত, প্রভৃতি ব্রত অনুষ্ঠানে সুন্দর করে আলপনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। যেমন ফরিদপুর জেলায় অনাব্রত উপলক্ষে মেয়েরা যে আলপনা দেয় তা হল সর্বোপরি প্রজ্জ্বলিত সূর্য সর্বশক্তির আধার তার দুই পাশে শিব দুর্গা সৃষ্টির প্রতীক এবং সর্বনিম্নে অর্ধচন্দ্রকার চাঁদ। এই চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে আঁকা হয় ষোলটি তারাসহ বিশ্বপ্রকৃতি। নীচে পৃথিবীতে ভক্তের আসন। আর ডানদিকে কখনও চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে মেয়েদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অলংকার, চিরুনি, আরসি, লক্ষীর ঝাঁপি ও গৃহস্থালীর নিত্য উপকরণ। জীবনের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িত এই পরম আদরের বস্তুগুলি লক্ষী ও ঐশ্বর্যের প্রতীক।

বাঙ্গালী মেয়েদের সূচীশিল্প কাঁথাতেও এই প্রতীকচিহ্নগুলি দেখা যায় সাধারণতঃ মাঝখান জুড়ে থাকে বিরাটাকার অষ্ট বা শত বা সহস্রদল অলংকৃত পদ্ম বিশ্বপ্রকৃতির অভিব্যক্তি, চারকোণে কল্পতরু আর তার চারপাশে নানা পশুপাখীর সঙ্গে দেখি ঢেকি, কুলো, লক্ষীর ঝাঁপি, আরসি, চিরুনি

অলংকার। যে হাত আলপনা দেয় কাঁথার রূপসৃষ্টি সেই হাতই করে। উভয়ক্ষেত্রেই পদ্মের প্রস্ফুটন হয় বিন্দুকে কেন্দ্র করে বিশ্বশূন্যের প্রতীক। সৃষ্টিরহস্যের ইঙ্গিতসূচক বেদের সময় থেকে চলে আসছে। ষাদশ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত শূন্য পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। এই শূন্য থেকে জন্ম নেয় বিশ্বরূপী পদ্ম আর শিব ও দুর্গা আদি জনক জননী। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হয়ে চলেছে। আবার আলপনায় গোলাকার রেখাসমূহ কালের পরিবর্তনশীল গতি নির্দেশ করে, কখনও কখনও কুলকুণ্ডলী অন্ধকারের করাল রূপের পরিচায়ক। পৃথিবী বা ভূ হচ্ছে আদি নমনীয় বস্তু—যাকে প্রকৃতি হিসেবে কল্পনা করা হয়। এই বসুধাকে মাতৃরূপে কল্পনা করে তাকে কত নামেই না বাঙ্গালী আখ্যায়িত করেছে—অদিতি, শ্রী, মহামায়া ইত্যাদি। অন্যদিকে মনসা শীতলাকেও মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়। সর্পদেবী মনসার পূজো বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। লোকশিল্পের এইসব প্রতীক ও রূপক এখনও পর্যন্ত আলোচনা ও গবেষণা সাপেক্ষ। তবে বাঙালীর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার গভীর সংযোগ সন্দেহাতীত।

লোকশিল্পের অসংখ্য নিদর্শন সারা বাংলাদেশে একসময় দেখতে পাওয়া যেত। আজ অবশ্য সংগ্রহশালার গ্যালারীতে তার কিছু স্থান পেয়েছে। আর কতরকম বস্তু দিয়েই না এগুলি তৈরী হতো। মাটি, কাঠ, বেত, বাঁশ, কাগজ, শোলা, কাপড় প্রভৃতির সাহায্যে রূপ সৃষ্টি করে নানাবর্ণের দেশীয় রং দিয়ে শিল্পী চিত্র আঁকতো অলংকরণ করতো। কাঁথা, পট, পাটাচিত্র, চিত্রিত সরা ও তাস, অলংকৃত হাড়িকুড়ি, মূর্তি, পুতুল খেলনা আরও অগণিত উদাহরণ। রূপ রং ঐশ্বর্য বর্ণাঢ্য, কিন্তু অনাবিল সারল্যের মূর্ত প্রতীক।

কাঁথা বাংলাদেশে সর্বত্র বহুল ব্যবহৃত এবং পুরনো কাপড় জোড়া দিয়ে তার উপর রং বেরঙের সুতো দিয়ে সূচীশিল্পও আশা করি কারও অজানা নয়। নিরক্ষর ও গৃহকর্মে নিপুণা মেয়েদের বোনা এই কাঁথা রূপ ও রঙে ভরা নকসায় এক সামঞ্জস্যময় রূপ সৃষ্টি করতো। কোনরকম ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করতো না—প্রিয় আত্মীয় পরিজনকে পালপর্বে ও শীতকালে গায়ে দেওয়ার জন্যে কিংবা আরশী বা বই-বাক্সের ঢাকা করার জন্যে উপহার দেওয়া হত। এক-একটি কাঁথা তৈরি করতে ছ' মাস পর্যন্ত সময় লাগতো—বড় এবং সূক্ষ্ম কারুকার্যকর কাঁথা কখনও কখনও তিনপুরুষ ধরে তৈরি হতো। ব্যবহার অনুযায়ী কাঁথার আয়তন ঠিক হতো। যেমন বড় কাঁথাকে বলা হতো সুজনী, যেটা অপেক্ষাকৃত ছোট চারকোণা কাঁথা আর সবচেয়ে ছোট ঈষৎ লম্বাটে ধরণের কাঁথাগুলোকে বলা হতো আরশীলতা। যদিও বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র কাঁথা প্রচলিত, কিন্তু বেশী সংখ্যায় সূক্ষ্ম কারুকার্যে অনবদ্য কাঁথা পাওয়া গেছে যশোহর খুলনা ও ফরিদপুর জেলা থেকে। কাঁথায় যারা সূঁচের ফোঁড় তোলে তারাই আবার জমির নকসাগুলো আঁকে। এদিক থেকে হিমাচল প্রদেশের সূচীশিল্প রুমাল থেকে স্বতন্ত্র। বাদেঘেলী কাংড়া ঢম্বা রুমালের নকসাগুলি আঁকতো পেশাদার চিত্রকররা। ফলে অঙ্কনে সমকালীন চিত্রশিল্পের ছাপ দেখা যায়। কিন্তু কাঁথায় অপটু অঙ্কনে archaic বা সনাতন ভাবধারাটি আদিম শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাঁথার নকসা ও তার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতগুলো তত্ত্বপূর্ণ—একথা আগেই বলা হয়েছে। মাঝখানের পদ্ম বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক আবার প্রস্ফুটিত পদ্ম প্রাক্ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারুত, সাঁচী, অমরাবতী

ও অন্যান্য স্থানের ভাস্কর্যশিল্পে দেখতে পাওয়া যায়। চারকোণে কল্পতরুকে অনেক সময় কৃষ্ণের প্রিয় গাছ কদম বলে মনে করা হয়। অনেক কাঁথাতে বৃক্ষের পরিবর্তে বড় বড় কল্কা দেখা যায়—পারস্য দেশ থেকে এগুলির উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। বাইরের দিকে নানা ফুল লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকসা দিয়ে সীমানা টেনে সুন্দর জমি তৈরী করে। কাঁথা সম্পূর্ণ ভরাট হলে রং বেরঙের লতাপাতা ফুল পশুপাখী নিত্যব্যবহার্য বস্তুর সমন্বয়ে এক অপূর্ব রূপের সঞ্চার করে। কাঁথাতে অনেক সমকালীন শিল্পের প্রভাব দেখা যায় যেমন পোড়ামাটির পুতুল, পট, সমকালীন মন্দির। কাঁথার মধ্যে দিয়ে যেমন সনাতন লোকশিল্পের ভাবধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে সমকালীন পোশাক-আশাক সহ অন্যান্য বহুবিধ সামাজিক চিত্র আমরা দেখতে পাই।

বাংলাদেশে লোকচিত্রের যে সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার মধ্যে পট, কালিঘাট পট, পাটা, তাস লক্ষ্মীসরার নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। পট বা যমপট নামে একধরণের চিত্রধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে—ভগবান বুদ্ধ একসময় একটি 'চরণচিত্র' ছবি দেখে প্রশংসা করেছিলেন। মূলতঃ ভারুত, বোধগয়া, সাঁচীর ধারাবাহিক ভাস্কর্যচিত্র ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ণিত। এই চরণচিত্র পদ্ধতি বাংলাদেশের জড়ানো বা দীর্ঘল পটে দেখা যায়। রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যকথা, মনসামঙ্গল, কমলে কামিনী ও সমকালীন সামাজিক গল্প নিয়ে পটুয়া বা পটোরা পট আঁকত। এইসব পৌরাণিক আখ্যানকে নিয়ে তারা মুখে মুখে গান বাঁধত, তারপর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে গান সংযোগে পট দেখাতো। এদিক থেকে পটুয়ারা একাধারে শিল্পী, কবি, সুরকার। লম্বালম্বিভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে অনেকটা ঠিক বর্তমান সিনেমার মত দুই প্রান্তে দুটো বাঁশের লাঠি দিয়ে বাঁধা। বাঁ হাত দিয়ে আস্তে আস্তে খুলে ডান হাতে একটা লাঠির সাহায্যে পট দেখানো হত। মজার কথা হচ্ছে পটে বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, শেষ দুটি দৃশ্যে দেখানো হত ভয়ঙ্কর দর্শন যমরাজা ও নরকে পাপের শাস্তি বিধান। এইজন্যে পটের আর এক নাম যমপট। এই যমপট দেখানোর একটি সুন্দর বর্ণনা আমরা পাই বাণভট্টের হর্ষচরিতে। রাজা রাজ্যবর্ধন, পিতা প্রভাকর বর্ধনের নিদারুণ অসুখের সংবাদ শুনে রাজধানীতে ফিরছিলেন। প্রাসাদে ঢোকার মুখে দেখলেন একটি গাছতলায় একজন পটুয়া বাঁ হাতে একটা যমপট ধরে ডানহাতে লাঠি দিয়ে দেখাচ্ছে এবং ছেলে, বুড়ো, যুবক সকলে তাকে ঘিরে দেখছে। সভাকবি বাণ বোধহয় পিতার আসন্ন মৃত্যুর জন্যে রাজ্যবর্ধনকে প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাংলাদেশে পটুয়ারা যম ও নরক দৃশ্যের অবতারণা করে মানুষকে পাপ থেকে বিরত হওয়ার নৈতিক শিক্ষা দেয়।

দুটি জড়ানো পট ছাড়াও চৌকো পট আঁকার রীতি ছিল। একটি ঘটনা নিয়ে এইসব চৌকো পট তৈরী হতো। তবে জড়ানো পট ছিল বহুল প্রচলিত—লম্বায় প্রায় ১০।১২ হাত থেকে শুরু করে ২৫।২৬ হাত পর্যন্ত হতো। কাগজ জোড়া দিয়ে পিছনে কাপড় এটে শক্ত করা হত—তারপর উজ্জ্বল লাল, হলদে, কাল, সাদা, নীল ও সবুজ দিয়ে বর্ণাঢ্য করা হত। ছন্দময় গতিশীল রেখানির্ভরশীল এই চিত্রধারা গ্রাম্যজীবনে সহজ সরলভাবে দীপ্যমান। কোনরকম গভীরতা না থাকলেও ঘটনায় অংশ গ্রহণকারী পাত্রপাত্রীকে এক-একটা নাটকের দৃশ্য বলে মনে হয়—হঠাৎ যেন কোন মন্ত্রবলে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতির দৃশ্যে অবশ্য হাত পা অনেক সময় বিকৃত করে দেখান হয়—লোকচিত্রে

এটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ পটুয়াদের শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক—সনাতন ধারাকে অনুসরণ করেই এরা ছবি আঁকতে অভ্যস্ত ছিল।

পটের ধারা মূলত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোতে দেখা গেলেও দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলাতে দেখা যায়। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে গাজী ও কালুনামী বাঘের লড়াইকে নিয়ে এক ধরণের পট ২৪ পরগণা, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা জেলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই পট গাজীপট, সত্যপীর পট নামে খ্যাত। তেমনি সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, মেদিনীপুর জেলাতে যাদুপট বা চক্ষুপট দেখা যেত। আদিবাসীদের অদ্ভুত বিশ্বাস সংস্কার ছিল এ পটের বিষয়বস্তু। কোন পরিবারে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে যাদুপটুয়া এই ব্যক্তির অনুরূপ একটি মূর্তি আঁকত। মূর্তিটিকে অন্ত্য সবদিক থেকে সম্পূর্ণ করলেও চোখের মণিদুটো আঁকা হত না। যাদুপটুয়া মৃতের পরিবারবর্গকে বলতো মৃতব্যক্তি পরলোকে গিয়ে চোখের অভাবে অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পটুয়াকে টাকা পয়সা বা জিনিসপত্তর দিলে সে চক্ষুদান করলে মৃত শান্তি পাবে। তারপর প্রাপ্তবস্তু পাওয়ার সঙ্গে সে চোখের মণি এঁকে দিত। বোধহয় আধিভৌতিক চিন্তা থেকে এই ধরণের যাদুবিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল। এছাড়া সাঁওতালপটে কৃষ্ণলীলা উপাখ্যানও দেখতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পটের সহজ সরল আবেদন ও প্রকাশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলী জেলাতে পটুয়াদের বাস দেখা যায়। তার মধ্যে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া থেকেই অধিক পরিমাণে পট পাওয়া যায়। বীরভূমের পটোরা আবার ধর্মে মুসলমান কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানে হিন্দু। একাধারে নামাজ পড়ে আবার হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে এবং ঠাকুরদেবতার মূর্তি আঁকে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাভেদে পটোদের নিজস্ব ঢং ও রীতি দেখা যায়। যেমন মেদিনীপুর ও হাওড়ার পটে পাত্র-পাত্রীর ভিড় এবং অলংকরণের প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যদিকে বর্ধমান বীরভূমে গাঢ় লাল ও হুগলিতে ঘন বাদামীর রং দিয়ে দেখান হয়। বীরভূমে আবার দুটো ভ্রু আঁকার রীতি প্রচলিত।

ঠিক বাংলাদেশের মত না হলেও গুজরাতে একধরণের পটুয়া দেখা যায় তার নাম 'চিত্রকথী'। এরাও গান গেয়ে চিত্র দেখিয়ে বেড়ায়। দক্ষিণ ভারতেও পটের মত ছবির ব্যবহার আছে। তবে এখানে গান বা আবৃত্তি করা হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় কালিঘাট একটি অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে একদল পটুয়া এখানে একটি চিত্রধারা প্রচলিত করে। এই পটুয়াদের কালিঘাট পটো এবং তাদের চিত্রধারা কালিঘাট পট নামে প্রসিদ্ধ। দেশী হাতে তৈরী তুলোট কাগজের উপর পরিচ্ছন্ন বলিষ্ঠ অথচ ললিত ছন্দময় রেখার ছবি আঁকায় এরা ছিল সিদ্ধহস্ত। রেখার গতি এত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ যে রেখা কোথায় শুরু বা শেষ হয়েছে ধরা দুষ্কর। রেখার উপর এইরকম দক্ষতা স্বভাবতই অজন্তার চিত্রধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবী পশুপক্ষী, সমকালীন সামাজিক ঘটনাবলী কিছুই এদের তুলির বহির্ভূত ছিল না। শহরে ঢং ছিল এ ছবিতে, বেশ কিছু পরিমাণে বধিষ্ণু কলকাতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত, কিন্তু রঙের ঔজ্জ্বল্যে, রেখার বলিষ্ঠতায় এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অতিনব। কালিঘাট পটুয়াদের তুলিতে দেখতে পায় সমকালীন পশ্চিমী সভ্যতায়

দীক্ষিত ইঙ্গবঙ্গীয় সমাজের প্রতি তীর্যক ও ব্যঙ্গ। গত শতাব্দীর শেষেরদিকে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে প্রচুর পরিমাণে লিথো ও মুদ্রিতচিত্র কলকাতার বাজার ছেয়ে যাওয়াই অবশেষে পটুয়াদের পটের সমাদর কমে গেল। বর্তমান শতকের প্রথমদিকেও কালীঘাট পটের অস্তিত্ব ছিল এখন কালীঘাট থাকলেও পট ও পটুয়া নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

আর এক ধরণের লোকচিত্রের নজির দেখতে পাই পাটাচিত্রে। এই পাটাগুলি কাঠের পুঁথির মলাট হিসেবে ব্যবহারের জন্যে তৈরী করা হত। এর আয়তন আয়তক্ষেত্র এবং তার উপর নানা বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি দেখা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্র আর চৈতন্য চরিতামৃতের কয়েকটি আলেখ্য। সিঁদুরে লাল, সাদা হলুদ ও উজ্জ্বল নীল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ছবিগুলি নিখুঁত; বিন্যাসে, দেহগত লালিত্যে, দৃঢ়তায় ও পর্যাপ্ত পরিশীলনের আনুকূল্যে এগুলি সমৃদ্ধ। একদিক থেকে এই ছবিগুলি বাংলার প্রাচীন পুঁথিচিত্রের উত্তরসূরী অন্যদিকে বাংলার বিশিষ্ট ও প্রাণরসে পূর্ণ পটচিত্রের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ যুক্ত। গীতিকবিতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আঁকা এই চিত্রগুলিতে গীতিকবিতার প্রাণধর্ম নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বিষয়ক ছবি কথানার উল্লেখ করা যেতে পারে। পাটাচিত্র পশ্চিমবঙ্গের যে কটি জেলা থেকে পাওয়া গেছে তার-মধ্যে বাঁকুড়া বীরভূম মুর্শিদাবাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে ধর্মীয় আচার আচরণ ও শিল্পের নিকট সম্বন্ধ দেখতে পাই আমরা চিত্রিত মাটির সরা ও ঘটগুলোতে। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় বিশেষ করে এই সরা ও ঘট পূজোর প্রচলন খুব বেশী। ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে সর্পরূপী ও মনুষ্যরূপী মনসার পূজো অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। ঘটের উপরদিকে অপূর্ব বিন্যাসে উজ্জ্বল রং দিয়ে দেবী মনসার ভয়াবহ ও সৌম্য মূর্তি আঁকা ফরিদপুর বরিশাল প্রভৃতি জেলার কুমোরদের শিল্পদক্ষতার পরিচায়ক। অন্যদিকে কোজাগরী পূর্ণিমাতে প্রাচুর্যের দেবী লক্ষ্মীর বন্দনা পূর্ববাংলায় জাতীয় উৎসবের সূচনা করতো। এই উপলক্ষে ফরিদপুর ঢাকা জেলার কুমোরেরা এক ধরণের মাটির সরা তৈরী করতো—যার উপরদিকে কাছিমের পিঠের মত গোলাকার অংশে নানা রং দিয়ে ছবি আঁকত। এই ছবিতে লক্ষ্মীমূর্তি থাকলেও উপরের প্রধান স্থান জুড়ে আঁকা হতো দশভুজা দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ কিংবা রাধাকৃষ্ণ। নীচে বাহন পেঁচাসহ দেবী লক্ষ্মী হাতে ধানের গুচ্ছ বা ঝাঁপি, দুই পাশে চামর হাতে দুই সহচরী। সরাগুলি লক্ষ্মীসরা নামে পরিচিত হলেও অন্য দেবদেবীর মূর্তিই মুখ্যস্থান জুড়ে থাকতো এবং লক্ষ্মীর স্থান ছিল গৌণ। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করে মূর্তিগুলি আঁকা হতো বর্ণবিন্যাসে, রূপ ও রেখায় ছবিগুলো ছিল গ্রাম্য সরলতার প্রতিমূর্তি। জেলা ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন চিত্ররীতি গড়ে উঠেছিল—যেমন ঢাকাই, ফরিদপুরী, মুরেশশ্বরী, গবকী আচার্যী ইত্যাদি।

অপর দিকে বিষ্ণুপুরের গোলাকৃতি চিত্রিত তাসে কত রং বেরঙের ঐক্যতান চোখে ভেসে উঠে। বিচিত্র অলংকরণে ভূষিত এই তাসে বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি দেখা যায়। এক একটা সেটে মোট ১২০ তাস থাকে—প্রত্যেক অবতারের দশখানা করে এবং সেই সঙ্গে যথাক্রমে তাঁদের প্রতীক চিহ্ন মৎস্য, কূর্ম, শঙ্খ, চক্র, কমণ্ডলু, কুঠার, তীর, গদা, পদ্ম ও তরোয়াল। বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের সময়ে এই তাস অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল—মল্লরাজাদের দেওয়া খেতাব ফৌজদার নামে সূত্রধর চিত্রকর সম্প্রদায়

এই তাস তৈরী করতো। এই তাস তৈরীর পদ্ধতিও ছিল আয়েস সাপেক্ষ। যদিও গঞ্জিকা নামে প্রতিবেশী উড়িষ্যার চিত্রিত তাসের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নয়, কিন্তু বিষ্ণুপুরের এই তাস বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গিমায় ও ছন্দময় মাধুর্যে বাঙ্গালীর লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করে।

পুতুল ও খেলনা একসময় বাংলাদেশের সর্বত্র তৈরী হত। আর পুতুল তৈরী হত নানা প্রকার বস্তু দিয়ে—মাটি, কাঠ, কাপড়, শোলা আরও অনেকরকম জিনিস দিয়ে। এর মধ্যে পোড়ামাটির পুতুলের প্রচলন সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্যাপকভাবে চলে আসছে। হাতে গড়া ও ছাঁচে তৈরী দুই ধরণের পুতুলও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—এদের গ ন ও আকৃতির সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের প্রাপ্ত প্রাক্ ইতিহাস ও ইতিহাস সময়কার পুতুলের বহু নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন বর্তমানে বীরভূম কিংবা মেদিনীপুরের নাড়াজোলে পাওয়া মাতৃমূর্তির সঙ্গে ৫০০০ বৎসর আগেকার হরপ্পায় প্রাপ্ত মাতৃমূর্তির অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করা যায়। অনেক পশু ও পাখীর গঠনেও সুপ্রাচীনকালের ছাপ স্পষ্ট। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের পুতুল ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। যেমন বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে পুতুলের গড়নে লম্বা চোঙের মত শরীর এবং সরু বাঁকানো চোঙের আকৃতির হাত; একহাত কোমরে অন্য হাত মাথার উপর কিছু ধরা অবস্থায় দেখা যায়। অন্যান্য রং ছাড়াও এসব অঞ্চলের কোন কোন পুতুলে অভ্র থেকে তৈরী সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। নাড়াজোলের পুতুলের গড়নের বৈচিত্র্য ও বর্ণপ্রলেপে নানা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সাধারণতঃ সাত আট ইঞ্চি উঁচু হয়—প্রথমে খড়িগোলা দিয়ে তার উপর অন্যান্য প্রাথমিক রং দিয়ে তাকে বর্ণাঢ্য করা হয়। তার উপর বেলের আটা দিয়ে তৈরী একরকমের প্রলেপ লাগিয়ে রং এর উজ্জ্বলতা বাড়ান হয়। রাধাকৃষ্ণ গৌরনিতাই, ঝাঁপিকোলে লক্ষ্মী, সন্তান কোলে মাতৃমূর্তি, কেড়ে মাথায় গয়লানী, লালপেড়ে শাড়ীপরা গেরস্থ:বৌ আরও কতরকমের পুতুল তৈরী হত এখানে। নতুন গ্রামের কাঠের পেঁচা ও গৌরনিতাই মূর্তি গঠনের বৈশিষ্ট্যে ও বর্ণের দ্যোতনায় খুবই জনপ্রিয়। মজিলপুরের পুতুলের গড়ন ফাঁপা চোঙের মত দু'ভাগে তৈরী করে জুড়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে কুমোরের চাকে তৈরী মকুট মাথায় দক্ষিণরায়ের মূর্তিগুলো উল্লেখযোগ্য। কলকাতার কালীঘাটেও একসময় কাঠের তৈরী পুতুল পাওয়া যেত। রঙের উজ্জ্বলতায়, নিপুণ অলংকরণে ও বেশভূষায় এই পুতুল ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঢাকা চট্টগ্রাম, মৈমনসিং, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাতেও কাঠ ও পোড়ামাটির তৈরী নানারকম পুতুল ও খেলনা পাওয়া যেত যার গঠনে ও রঙে শিল্পীর নিপুণ হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। এছাড়া শোলা, কাগজ, কাপড় নির্মিত শত শত পুতুল ও খেলনা পাওয়া যায়, যার মধ্যে দিয়ে বাংলার লোকশিল্পের প্রবাহমান ধারা সহজেই অনুমেয়। বাঙালী জীবনের মাধুর্য বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে এই সমস্ত রং বেরঙের রকমারি পুতুল ও খেলনা।

মৃত্যুচেতনা ঃ জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বেদনা যে প্রেরণা আনে শিল্পীর অন্তরে তাই হলো সৃষ্টির পক্ষে অন্যতম প্রেরণা। বেদনা যত তীব্র হয় সৃষ্টি হয় তত উজ্জ্বল। ব্যথার প্রলেপেই গোলাপে গোলাপে বাণী জেগে ওঠে। অলৌকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেন তার পক্ষে বেদনা অপার। আর এই অপার বেদনার কেন্দ্র হলো মৃত্যু।

অবশ্য বেঁচে থেকেও মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে হয়। জর্জরিত হতে হয়। রক্তাক্ত হতে হয়। বেদনার্ত হতে হয়। ক্লান্তস্বর বেরিয়ে আসে শিল্পীর কণ্ঠ থেকে I fall on the thorus of life, I bleed। ডানাভাঙা বিহঙ্গের কাকলীর মতন শোনা যায় কোন কবি কণ্ঠ : অব কাঁটোমে রাহ কিয়ে যা রাহা হুঁ ম্যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর অনেক শিল্পী সাহিত্যিক ও দার্শনিকের জীবন ও রচনা মৃত্যুর ছায়াতে ম্লান। গোধূলির আলো-আঁধারে আচ্ছন্ন।

বিশ শতকে শিল্পের দিকদর্শন পরিবর্তিত হলো। যন্ত্রযুগের কর্মব্যস্ততা মৃত্যুর ছায়াকে দূরে ঠেলে দিল। বড় হয়ে দেখা দিল আজকের জীবন; বর্তমান জীবনের সমস্যা ও বেদনা স্থান পেল সাহিত্যে। মনোবিশ্লেষণ, নানান চেতনা প্রবাহরীতি অধিকার করলো সাহিত্যে। দেখা গেল, দেহের মৃত্যুর চেয়ে মনের মৃত্যু আরও বেশী তীব্রতর। আরো মর্মান্তিক! সাহিত্যিকেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন মানুষের মন নিয়ে। ট্র্যাজেডি সৃষ্টির জন্য দৈহিক মৃত্যু আর অপরিহার্য হয়ে উঠলো না। কিন্তু তার মানে কি এই শিল্পের দিগন্ত থেকে চিরতরে নির্বাসিত হলো মৃত্যুচেতনা? অবশ্যই নয়।

বিশ শতকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক টমাসমান প্রাধান্য দিয়েছেন মৃত্যুকেই। মৃত্যুর এমন সর্বব্যাপী প্রভাব আর কারো রচনাতে আমাদের চোখে পড়ে না। মান মৃত্যু ও জীবনের দ্বন্দ্ব—এ দু'য়ের মধ্যে মৃত্যুকেই বড়ো করে দেখেছেন এবং মৃত্যুর যথার্থ পটভূমিরূপে এনেছেন যক্ষা, সিফিলিস, গণোরিয়া ইত্যাদি মারাত্মক রোগ এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পরিবেশ। মান এই মৃত্যুচেতনা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন নীটশে, শোপেনহাউহার ও রিচার্ড ভাগনারের কাছ থেকে। মানের বুডেনব্রুকস এই মৃত্যুচেতনারই গোধুলি আলোকে আচ্ছন্ন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থেই মান কোন না কোনরূপে মৃত্যুকে উপস্থিত করেছেন। মৃত্যু তাঁর চোখে কয়েক মুহূর্তের একটি নৈতিক ঘটনা নয়। অন্তিম প্রহর ঘনিয়ে আসার অনেক পূর্ব থেকেই মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। নৈতিক অধঃপতন, দেহের অবৈধ কামনা ও রোগ সেই যাত্রার পথ প্রস্তুত করে।

মৃত্যুকে মান কখনো দেখেছেন রোগপাণ্ডুর তরুণীর মুখের করুণ লাবণ্যের মতন। আবার কখনো মৃত্যু এসেছে তাঁর কাছে পরিত্রাতার রূপ নিয়ে।

মৃত্যুচেতনা ডি, এইচ, লরেন্সের সন্স এ্যাণ্ড লাভারসকে একটি নম্রমনোহর সৌকর্য দান করেছে। মোবিডিকে মৃত্যু এক দার্শনিক উপাঙ্গে হয়েছে উপনীত। মৃত্যুর একটি স্বাভাবিক

চিরন্তনসমাপ্তি দেখে ধন্য হওয়া গেছে এ্যানাকারানিনাতে। স্তাঁদালের লাল কালোতেও মৃত্যু রেখেছে তার চরণচিহ্ন। টমাস হার্ডির উপন্যাসেও মৃত্যুর আত্যন্তিকতা হয়েছে অসীম শিল্পস্বমায় মণ্ডিত। ইংরেজী সাহিত্যে মৃত্যু মহান হয়ে গেছে টেনিসনের কাব্যে—ইনমেমরিয়ামে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুকে নিয়ে শিল্পীর চৈতন্য বোধকরি আলোড়িত হয়েছিল সাহিত্য সৃষ্টির উষালগ্নেই। চর্যাপদের কোন কোন পদেই শোনা গেছে তার মৃদু কলতান। তারপর মঙ্গলকাব্যে—বিশেষতঃ মনসামঙ্গলে মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয় জীবনকে করা হয়েছে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে ঐতিহাসিক কালানুক্রমিকতায় আমরা যাব না এখন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—বাংলা সাহিত্যের এই তিনীর্ষেও দেখেছি মৃত্যুকে জয় করা মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনস্বর্গের অরুণিমা বিচ্ছুরিত নানাস্থানে।

আমরা দেখবো এই শতকের প্রতিনিধিস্থানীয় একজন কবি ও দুজন সাহিত্যিক—জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুকে কোন চেতনার আলোকে করেছেন উদ্ভাসিত? মৃত্যু সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ ধারণা কি? জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে অধিকাংশ সময়ই অপূর্ব রূপনিকেতন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তা বলে তাঁর কবিতার মধ্যে যুগযন্ত্রণার ছায়াসঞ্চার ঘটে নি, এমন কথা উচ্চারণ করা সঙ্গত হবে না কখনোই। তিনিও আশ্চর্যরকমভাবে আধুনিককালের যুগযন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছেন। শুনিয়েছেন—

নাম তব মুছে যাবে মুসাফের—অঙ্গারের পাণ্ডুলিপিখানি
নোনাধরা দেয়ালের বুক থেকে খসে যাবে কখন না জানি!
(ওগো দরদিয়া)

অঙ্গারের পাণ্ডুলিপির নোনাধরা দেয়ালের বুক থেকে খসে যাবার চিন্তা অবশ্যই এক অন্তিম প্রহরের চিন্তা। আমি বলতে বাধ্য, এ মৃত্যু চেতনারই নামান্তর।

এলিয়টের পোড়োজমির মতন জীবনানন্দ হেমন্তের মাঠে বসে দেখেছেন বিষন্ন মৃত্যুরই পদপাত—

চিলের সোনালি ডানা হয়েছি খয়েরি;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কাঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে
(দুজন; বনলতা সেন)

আর এই কারণেই তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যেও আমরা আবিষ্কার করবো এক আশ্চর্য নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ। এক বিষন্নকণ্ঠের উচ্চারণ :—

একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা।
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুকে অবহেলা।
একদিন—একরাত, তারপর প্রেম গেছে চলে—

শুনতে পাবো—

হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াওড়ি!
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্খার ভূতলয়ে খেলা!—
আমরাও ছায়া হয়ে—ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি!
—মনের নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা।
(জীবন ৭ সংখ্যক, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দের কাব্যে এমনই ঘনীভূত আবেগে উচ্চারিত হয়েছিল যে যার জন্য গ্রন্থের নামকরণেও তিনি তাকে ছাড়তে পারেন নি। ধূসরপাণ্ডুলিপি, ঝরাপালক, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা ইত্যাদি প্যারাডক্সিক্যাল নামগুলিতেও এই চেতনারই পড়েছে দেখি অভ্রান্তস্বাক্ষর।

অবশ্য মৃত্যুর আগের কবিতাও লিখেছেন তিনি। কিন্তু সেখানেও জীবনের 'হ্যাঁ' ধর্মকে তেমন বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণের সহিষ্ণু আবেগ আছে কি? হয়তো অবশ্য সচেতন কবিরপক্ষে অত তাড়াতাড়ি তা' উচ্চারণ করা সম্ভবপরও নয়। তাইতো খুঁজতে হয়। অনুসন্ধান চালাতে হয়। আসে তখন ইতিহাসচেতনা—ভূগোলের সাম্রাজ্য পরিক্রমা—গ্রীস্, পোলাণ্ড, চেক, প্যারিস, মিউনিক, টোকিও, রোম, নিউইয়র্ক, ক্রেমলিন, আটলান্টিক ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু? কিন্তু এই ইতিহাস পরিক্রমাও ব্যাহত কবিকে তাঁর ব্যথা নিরাময়তার উপকূলে পৌঁছে দিতে পারে না। বস্তুজগতের শূন্যতা অন্তরজগতের শূন্যতারই দ্যোতক মেনেও ইতিহাসের বিশাল অরণিলোকে অরণ্যযাত্রা পরিত্যাগ করতে পারেন না কবি। তথাপিও জমা হয় কেবল বিলুপ্ত হৃদয় মৃত চোখ আর বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা।

মৃত্যুকে বড়ো বেশী অনুভব করেছিলেন কবি জীবনানন্দ। তাই তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব হয়েছিল—

চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দী রোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনদিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সঙ্গমছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।
কেবলি আসন থেকে বড়ো, নবতর
সিংহাসনে যাওয়া ছাড়া গতি নেই কোনো।
মানুষের দুঃখ কষ্ট মিথ্যা নিষ্ফলতা বেড়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে জাগতিক মৃত্যুর সব লক্ষণগুলিই উল্লিখিত পংক্তিগুলিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন কবি।

তিনি বুঝতে পেরেছেন মানুষ ও পৃথিবীর ব্যথার কেন্দ্রটিকে। বুঝতে পেরেছেন মানুষের মুক্তি। প্রগতি কোনদিন কোন সরল রেখায় হয় না। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক একটি স্মরণীয়

যুগের পরই অন্ধকার ঘনিয়ে আসাই হলো স্বাভাবিক নিয়ম ও দুর্বার নিয়তি।……

জীবনানন্দ মৃত্যু সচেতন। তিনি হেমন্তের কবি। তাঁর কাব্যের যত্রতত্র মৃত্যু ও মৃতদের আসা যাওয়া। ধূসর গন্ধ আর ঘুমের ঘ্রাণে আচ্ছন্ন সবকিছু। তার কারণ কি ?

'জীবনের উল্লাসকে পূর্বোক্ত কবিরা দেখেছিলেন বলে তাঁরা আশাবাদী আর জীবনের ক্ষয়িষ্ণুরূপকে আধুনিক কবিরা দেখলেন বলেই তাঁরা জরা ও মৃত্যু চেতনায় অবসন্ন, ক্লান্ত। এ জন্যে হেমন্তের ধূসরবর্ণে জীবনানন্দের চিত্রকল্প সার্থকরূপ লাভ করল।' (আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠি। পৃঃ ১৫৮)

বিভূতিভূষণের রচনাতেও মৃত্যুর ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিন্তু মৃত্যুকে তিনি কখনোই ভয়াল, ভয়ংকররূপে দেখেছেন বলে মনে হয় না। মৃত্যু তাঁর কাছে টমাসমানের মতন এক করুণ লাবণ্যের চিত্র, মহান পবিত্রতার মতনই প্রতিভাত। মুক্তির কুঞ্চিকা হাতেই আবির্ভূত। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ পথের পাঁচালীতে মৃত্যুবর্ণনা আছে দু'বার—একবার হরিহর রায়ের দূরসম্পর্কের দিদি ইন্দির ঠাকুরণের মৃত্যু আর একবার দুর্গার মৃত্যু। ইন্দির ঠাকুরণ এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, অনাদর অবহেলার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

সর্বজয়ার সঙ্গে জীবিতাথাকাকালীন ইন্দিরঠাকুরণের যে সম্পর্কটি ছিল, বলাই বাহুল্য তা' খুব মধুর ছিল না। প্রতিপদেই যন্ত্রণা, কলহ, কথাকাটাকাটি সর্বজয়ার সঙ্গে। বৃদ্ধবয়সের অনাদর, অবহেলা। সংসারে সে ছিল নিতান্তই বাহুল্য। কেবল দুর্গাই ছিল তার একটুকু সান্ত্বনার অবকাশ। দুর্গা তাকে বড়োই ভালোবাসতো তাই আতা খাবার অপরাধে গঞ্জনা সহ্য করে দুপুরের কিছু আগে ইন্দির ঠাকুরণ যখন তার ঘটিবাটি ও কাপড়ের পুটলি নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল, দুর্গা এসে তাকে বাধা দেয়। মাদুর ধরে টানাটানি করে। সর্বজয়াও এই সময়ে গৃহস্থের অকল্যাণ করে বুড়ীকে চলে যেতে নিষেধ করে। কিন্তু বুড়ি ফেরে না। সে গিয়ে গৃহস্থের গোলার পাশে মাচার তলায় আশ্রয় নেয়। যেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ইন্দিরঠাকুরণের এই করুণমৃত্যু কৌলিন্যপ্রথারই বিষময় ফল। যখন বাংলার নারী আপন গৃহে স্বামীপুত্র পরিবেষ্টিতা হয়ে মৃত্যু কামনা করে তখন সংসারের উপেক্ষিতা এই বৃদ্ধাকে পথের কুকুর বেড়ালের মত পথেই মৃত্যু বরণ করতে হলো। তথাপি এ মৃত্যুই বিভূতিভূষণের আকাঙ্খিত। কেননা তিলে তিলে মরার চেয়ে এই একেবারে পরিণতি, এতো অনেক শ্রেয়। অনেক ভালো।

এতো গেল একটি মৃত্যুর কথা। আরও একটি মৃত্যুর বর্ণনা আছে পথের পাঁচালীতে। সেটি তাঁর মানস-কন্যা দুর্গার মৃত্যু! দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর আঘাতে, জ্বরের প্রকোপে, বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে মারা গেল দুর্গা। অপুর একমাত্র সাথী দুর্গা। কিন্তু দুর্গার এই মৃত্যুতেও কোন দুঃখ, ভয়ের ছায়া ঘনায়মান হয়নি।

জ্বরে ভুগছিল দুর্গা। বিকেলে অপু তার দিদির মাথার কাছে বসে জলপটি দিচ্ছিল। দুর্গা অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলল—শোন্ অপু, একটা কথা শোন্। আমায় তুই একদিন রেলগাড়ি দেখাবি ? পরদিন দুর্গা মারা গেল। পুজোর ছুটির সময়ে মেয়ের জন্য একখানা শাড়ী কিনে এনে বাড়ী ফিরে হরিহর মেয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ সমস্ত নিসর্গ প্রকৃতিতে একটি করুণ তান যেন পৌঁছে

দিয়েছেন। একটি প্যাথেটিক হারমোনি। পথের পাঁচালীর ভোরের ভৈরবী থেকে ইছামতীর সন্ধ্যার পুরবী পর্যন্ত তাঁর সুর, তাই মনে হয়, প্রকৃতিই যেন শান্তি আর কারুণ্যে বিন্যস্ত।

মৃত্যু করুণ হলেও বিভূতিভূষণের কাছে তাই-ই অন্তিম পরিণতি নয়। Death does not everything. Annihilation is not all তাইতো পথের পাঁচালীতে তিনি দেখিয়েছেন বৈশাখ মাসের শেষে হরিহর যখন নিশ্চিন্দপুরের বাস উঠিয়ে কাশী চলে যাবেন তখন দিদির স্মৃতিমাখা চারদিকের গাছপালা ও বনের দিকে চেয়ে অপুর মন কেমন করে উঠলো। পরদিন সকালে তারা ট্রেনে চড়লো। হু হু করে গাড়ী চলছে। হঠাৎ ওর মনে হলো, তার দিদি যেন ম্লানমুখে ঐ জামগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে তাদের রেলগাড়ীর দিকে চেয়ে আছে। সে ভাবল দিদিকে তার মা বাবা কেউ ভালোবাসত না। তাই তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অপু মনে মনে বললে, আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে।……

অপুর মনের এই যে পরিচ্ছন্ন বিকীরণ দুর্গার মৃত্যুই তাকে সম্ভব করে তুলেছে। অন্তিম নিমেষে নয়নে জলে উঠেছে প্রদীপ্ত বহ্নি ; কিন্তু এ বহ্নি মশাল জ্বালাবার নয়। আলো দেখাবার। যাতে মনের সব কালিমা কেটে যায়।

এমন মহান মৃত্যুর আলোতেই আচ্ছন্ন হয়েছে দেখি বিভূতিভূষণের বিরল সৃষ্টি কিন্নর দল, পুঁইমাচা, ফকির ও স্বলোচনা গল্প চতুষ্টয়।

তারপর মৃত্যু এসেছে দৃষ্টিপ্রদীপ ও দেবযানে। এখানে মৃত্যু অতীন্দ্রিয় চিন্তায় প্রজ্জ্বাল।

কিন্তু কোন দূরালোকে যাত্রার সাঁকো নয় বিভূতিভূষণের কাছে এই মৃত্যু। এই পৃথিবীতেই নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি। সমর্পিত তাঁর মন। তাই আমরা নাস্তিকগল্পে মৃত্যুমুহূর্তে বিশ্রুত পণ্ডিত লোকনাথের আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে চিরনিরুত্তরের ভাষা অন্ধকার পটে ভেসে উঠলো দেখি—"পথের বাঁকে একদিনের মেঘ ভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে কেঁদে ফুপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে ?… কেন আমায় মারবে ?……এ পাড়ায় আমি আসি বলে ?…দেখে নিও, আর কক্ষনো যদি আসি…

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাটবিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ, আবদ্ধ রইল—'

প্রকৃতিপ্রবণতা হোক্ আর জ্যোতিলোকচারণাই হোক—এই হোলো বিভূতিভূষণের মৃত্যু-চেতনার স্বরূপ। সমুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার। মৃত্যু হলো এই কর্ণধার। আর তার কাছে (মৃত্যুর কাছে) নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পরিতৃপ্তি, একটি করুণ মিনতিই তাঁর SWAN SONG।

যন্ত্রণাকেই যিনি তাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রেরণা বলে গ্রহণ করেছিলেন প্রথম থেকেই, যাঁর প্রথম গল্পেই এসেছিল মৃত্যু, তারপর থেকে প্রতিমুহূর্তের অবক্ষয়, জ্বালা, ব্যথা, বিষণ্ণতা অবারিত করে দিয়েছে তাঁর সৃষ্টির উৎসমুখ বাংলা, তথা বিশ্বসাহিত্যের সেই বিরলতম কথাশিল্পীটি হলেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম গল্প অতসীমামীতেই দেখা দিয়েছে মৃত্যু চেতনা। বাঁশি বাজাতে বাজাতে যতীনমামার গলা গলা দিয়ে রক্ত ওঠা, ঢাকা মেলে দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু, তারপর প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুর রাত্রিতে অতসীমামীর সেখানে বাঁশি বাজাতে যাওয়া…এই ছিল গল্পের মধ্যকার বিষয়।

কিন্তু এখানে মৃত্যুর মধ্যে রোমান্টিক কল্পনার চমৎকারিত্ব আর উচ্ছ্বাস। এটা একান্তভাবেই পাঠকের মন ভোলানো গল্প।

মানিকের কাছে মৃত্যুচেতনা অবশ্যই এতো জলো, এত হাল্‌কা ও লঘুছন্দ নয়। এ কাহিনী লেখার জন্য তিনি বাংলাসাহিত্যে অবতীর্ণ হন নি। তাই মৃত্যুকে অত সহজে গ্রহণে তাঁর জেগেছে দেখা যায় এক স্তুতীব্র অনীহা। তাইতো তিনি বিশ্বাস করতেন 'দুঃসহতম দুঃখের পঞ্চম অঙ্কেও জীবন নাটকের যবনিকা পড়ে না—তার চাইতেও অকল্পনীয় দুঃখের প্রেক্ষণপটে প্রাণ এবং প্রিয়জনের প্রতি মমতায় শুভ্রস্নিগ্ধ হৃদয় অকস্মাৎ একটি পূর্ণমধুচক্রের মতো টলমল করে ওঠে। এই কারণেই তিনি অনুভব করেছিলেন, তাঁর নীলমণির মতোই 'আত্মহত্যার অধিকার' তার নেই—'বেদনার দিগন্ত কোথাও সমাপ্তির বৃত্তিতে এসে মুক্তিলাভ করেনি; দিগন্তের পরে আরো দিগন্ত—তা অনিঃশেষ।'

মৃত্যুকে নিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সামান্য নয়। "পুতুল নাচের ইতিকথা" উপন্যাসে এই মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি এক আশ্চর্য দৃষ্টি দিয়ে। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে হারুর। বসতিহীন বিরল গাওদিয়ার সড়কের কাছে। বাজ পড়ে ঝলসে গেছে সে। তার মাথার সব চুলগুলো জ্বলে গেছে। সেই চুলের জন্য গোবর্ধন শোক প্রকাশ করেছে। এই মৃত মানুষের চুলের জন্য শোকপ্রকাশে ডাক্তার শশীর হাসি আসতো অন্যসময়। কিন্তু এখন এলো না। পরন্তু শশী এক গভীর আঘাত অনুভব করলো। কেননা হারুর ছেলেমেয়ে আছে, আত্মীয় বন্ধু আছে, সকলের চোখের আড়ালে একটা গাছের নীচে ওর একা-একা মরে যাওয়াটা তার কাছে শোচনীয় দুর্ঘটনা বলে মনে হলো। গোবর্ধনের কথায় তার মন আরও বিষন্ন হয়ে গেল।

গোবর্ধন শশীকে জিজ্ঞাসা করলো এহেন অপঘাতে মৃত্যুর ফলে হারুর মুক্তি আছে কিনা? শশী হাইতুলে কি জানির অধিক উত্তর দিতে পারে নি। এই হাইতোলা, উত্তর না দেওয়া শশীর বিরক্তির লক্ষণ মনে হলেও গোবর্ধনের কাছে আসলে তা নয়। এটা তার জীবনের প্রতি সুগভীর মমতারই পরিচায়ক। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং লিখেছেন কিন্তু তার চেয়েও গভীরভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তাহার মমতা। মৃত্যু এক এক জনকে এক-এক ভাবে বিচলিত করে। আত্মীয় পরের মৃত্যুতে যাহারা মর-মানবের জন্য শোক করে শশী তাহাদের মতো নয়। একজনকে মরিতে দেখিলে তাহার মনে পড়িয়া যায় না সকলেই একদিন মরিবে,—চেনা-অচেনা আপন পর যে যেখানে আছে প্রত্যেকে এবং সে নিজেও। শ্মশানে শশীর শ্মশান বৈরাগ্য আসে না। জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাব্য অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচিত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয় সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন। শশীর এই চেতনা যেন তার স্রষ্টা মাণিকেরই চেতনা। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রকৃতপক্ষে জীবনেরই উপাসক শশীর এই চিন্তার আলোতেই যেন তা' উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই মতিকে অর্থাৎ হারুর মেয়েকে মৃত হারুকে দেখাতে নির্দেশ দিয়েছে শশী। শুধু তাই নয় মৃত হারুকে যখন তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন বাহকরা যাতে হরিবোল না দেয় তাই শশী বলেছে—"এখন তোমরা হরিবোল দিও না। হারু শ্মশান যাত্রা করেনি, বাড়ী যাচ্ছে।"

শশী মৃত্যু চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে কোন নির্বেদে পৌঁছায় নি। তার চোখের সামনেই ঘটেছে একের পর এক মৃত্যু। মরলো হারু; মরলো ভুতো। কিন্তু শশী ভুতোকে প্রাণপনে চিকিৎসা করেছে। তথাপিও শশীর নিস্তার নেই। তার চারপাশেই মৃত্যুর সমারোহ। সে দেখে পাগলাদিদিকে। বার্ধক্যপীড়িত জীবন, সব যেন কৌতুকময়—ঘনানো মৃত্যুর স্বাদে পাগলাদিদি কৌতুকময়।

তারপর কুমুদকে কামড়ায় সাপে। কুমুদ বলে সে যদি এখনই মরে যায়। কিন্তু মতির ভালোবাসা তাকে মরতে দিতে রাজী নয়। বলে—দূর মরার কথা বলতে নেই।

মৃত্যুতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দারুণ আপত্তি। তাই পুতুল নাচের ইতিকথার নায়ক শশী পরিণত তাঁর "মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার ভাড়া করা সৈনিক"রূপে। শশীর কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তাইতো তিনি দেখাতে চেয়েছেন জীবনের জন্য নিয়ত উৎকাঙ্খা। অকুণ্ঠ ধৈর্য ও কর্ম উদ্‌যাপন। অসুস্থ গ্রামবাসীদের জন্য জীবনবাসনায় উন্মুখ শশীর জেগে উঠে করুণ ভাবনার স্বপ্নলোক—"স্ফূর্তি নয় আনন্দ, শান্ত স্তিমিত একটা সুখ। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনী শক্তির সঙ্গে, ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য। ওরা প্রত্যেকে রুগ্ন অনুভূতির আড়ত, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙা-গড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা: ভাবনাগন্ধ, আবছা কুয়াসা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলার ফুল। সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।"

সতেজ উত্তপ্ত জীবনের জন্যই বারবার মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে শশী। তাই বিন্দুকে সে নিয়ে আসে গাওদিয়াতে। কিন্তু বিন্দু এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে গাওদিয়াতে এসে। সে বিষ খায়। বিন্দুকে বাঁচিয়ে তুলবার কোনই আগ্রহ দেখায় না সে প্রথমে। তারও মনে হয় সাবেকী মৃত্যু চেতনায় আচ্ছন্ন সবাইর মত সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিন্দুর মৃত্যুটাই বোধহয় কাম্য এবং সম্ভাব্য পরিণতি। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই সে আবার ফিরে আসে আপনার স্বভূমিতে। বাঁচানোর চেষ্টা করে বিন্দুকে। শশীর এ প্রত্যাবর্তনকে কেবলমাত্র কাহিনীর নায়কের প্রত্যাবর্তন বলে ভুল করলে চলবে না। এ যেন তাঁর স্রষ্টা মাণিকেরই প্রত্যাবর্তন। যিনি ফিরে এসেছিলেন আত্মহত্যার অধিকারের চরম নির্বেদ থেকে পরিপূর্ণ জীবনবাদের প্রতিষ্ঠার বেদীতে। জীবনের প্রতি অসীম মমত্বও তথাপি বিচলিত হয় শশীর। রোগীর সেবা, নিরাময়ের ব্যবস্থা করাও বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর, মনে হয় মাঝে মাঝে। সে ভাবে, "এ দায়িত্ব সে মানিবে না, এত কৌসের নীতিজ্ঞান? গ্রামে তো সে ফিরিবে না একমাসের মধ্যে—সে কি মানুষের জীবন মরণের মালিক?

অবশ্যই নয়। মৃত্যু তো এক চিরহস্যময় ব্যাপার। শশীরই চোখের উপর তাই ঘটে যায় যাদব ও পাগলদিদির মৃত্যু—রহস্যময় ইচ্ছামৃত্যু। শশী তা অনুমান করতে পারে না।

তবে কি মরণও অপূর্ব লোভনীয়? শশী নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছে যাদব ও পাগলদিদির অপূর্ব ও লোভনীয় মরণ।

অতঃপর ঘটলো শশীর মিনাদিদির মৃত্যু।

এসবই অবশ্য দৈহিক মরণ। কিন্তু আত্মিক মরণ, মনের মৃত্যুর দৃশ্যও দেখতে হয়েছে শশীকে কুসুমের পরিবর্তনের মধ্যে। কুসুম নিজেই বলেছে :—"লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে

রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্য কোনও সুখ চাই না বাকী জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি—আর কোন আশা নেই, ইচ্ছে নেই। সব ভোতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"……

মাণিক তাঁর উপন্যাসে মৃত্যুর সমারোহ দেখলেও মৃত্যুকে বড়ো করে দেখানো অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। জীবনকে অসংখ্য ক্ষয় ক্ষতির মধ্যেও ভালবাসার কথাই যেন তিনি বারবার উচ্চারণ করতে চেয়েছেন।

"জীবনকে শ্রদ্ধা না করলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময় জীবন দেবতার এই রীতি।" মৃত্যুর মুহূর্তেও জীবনবাদী মাণিকের এই উক্তি। এই বোধ, এই চেতনার আলোকেই মহিমান্বিত তাঁর সমগ্র সাহিত্য বিচিত্রা—এমনই আমার মনে হয়।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মাণিকের মতন জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্পী আর কে আছেন? অপু, হরিহর গ্রাম্যসমাজের রুগ্ন আবেষ্টনী ছেড়ে চলে যেতে পেরেছে অতি সহজেই। কিন্তু মাণিকের শশী পারে নি। পারা কি সম্ভব?

মাণিক তা পারে নি। কারণ তাঁরও যে চিন্তা পাবলো নেরুদার মতনই—

'I am people, the innumerable people.
In my voice is the clear strength
that can traverse silence
and germinate in darkness.
Death, Suffering, shadows, frost
Suddenly descend on the seed.
And the people seem entombed.
But corn returns to earth,
Its red implacable hands
thrust through silence
From death comes our rebirth.'

জীবনাবসানের পরই আসবে পুনরুজ্জীবন। মৃত্যুর পরই জাগরণ। মানুষের স্নেহ, ভালবাসা, মমত্ববোধই সম্ভব করে তুলবে তা'। মাণিকের মৃত্যু চেতনা এই মমত্বের সুধা নির্ঝরেই অভিসিঞ্চিত। তাঁর মতন এমন দরদী কথা সাহিত্যিক যে কোন সাহিত্যেই দুর্লভ॥

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

পদ্য (বাল্যরচনা—পুস্তকাকারে অপ্রঃ) ॥

১ম ছত্র—"চন্দ্রাস্ত সহাস্য করে, উষাকালে সতী।" প্রথম প্রকাশ—'সংবাদ-প্রভাকর' ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫২। প্রথমে লেখা আছে—'ওগলি কলেজস্থ ছাত্রের লিখিত পদ্য অবিকল নিম্নভাগে প্রকটিত হইল।' কবিতাটির শেষে বঙ্কিমচন্দ্রের নামের আদ্য অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে—শ্রী ব, চ, চ।

উষাকালে একজন স্ত্রী স্বামীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে ও স্বামী অত্যন্ত কৌশলে তার উত্তর প্রদান করছে স্ত্রীর প্রশংসা সমেত। এইভাবে উক্তি প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কবিতাটি রচিত। পদ্যটির মধ্যে অনুপ্রাস এবং যমকের বাহুল্য থাকলেও বর্ণনাচাতুর্য নিতান্ত কম নয়। এ সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক লিখেছেন—"উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রবীণ কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত হইয়াছে, এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।" এই প্রবীণতা কেবলমাত্র রচনাকৌশলেই নয়, বিষয়বস্তুচয়ন ও বর্ণনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নইলে বালক কবি বলেন কেমন করে—

"স্ত্রীং। তবে কেন তুমি আমি, এক অঙ্গ নই।
পুং। দেহে যদি নই, কিন্তু, অন্তরেতে হই।"

অবশ্য বিবাহিত বালক কবির পক্ষে সবই সম্ভব।

পরিমাণ রহস্য (বিজ্ঞানরহস্য) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন' চৈত্র ১২৮০ ও আষাঢ় ১২৮১।

পরিমাণ-রহস্য বিভিন্ন জিনিষের statistics বা সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, পৃথিবীর ওজন, সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ, শব্দ, জ্যোতিস্তরঙ্গ, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের পরিমাপ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচনা কেবলমাত্র সংখ্যায় পরিপূর্ণ নয়। কোথাও কোথাও সরসতার আমদানী করা হয়েছে। যেমন—'মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ক্রীড়াযুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে নাকের চশমা খুলিয়া কানে পড়ি, কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধহয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন দেখা যাউক।"

পলাশির যুদ্ধ (পুঃ অপ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮২, পৃ,৩১৯-২৭।

নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের বঙ্কিমচন্দ্রের কৃত সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এই ঐতিহাসিক কাব্যটিকে উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন। কারণ ইতিহাসের আকরে এখানে কল্পনার প্রাচুর্য হয়ে গেছে। বায়রণের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বাস ও আবেগপ্রবণতা, স্বদেশপ্রেম ও বর্ণনারীতির মিল দেখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে বাংলার বায়রণ আখ্যা দিয়েছেন। এই আখ্যা নিয়ে বাংলাসাহিত্যে

বহুদিন নবীনচন্দ্রের চর্বিত চর্বণ সমালোচনা চলেছিল।

পলিটিক্স্ (ক: প:—২য় সংখ্যা) ॥

প্র: প্রকাশ—১২৮১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'।

'পলিটিক্স্' নামক পত্রটিতে রূপকছলে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের পলিটিক্যাল চিন্তাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি দু'জাতীয় পলিটিক্সের কথা বলেছেন। শিবু, কলুর পুত্র যখন উঠানে বসে ভাত খাচ্ছিল তখন একটি কুকুর সেখানে বহুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল এবং ক্রমে ক্রমে এগোচ্ছিল। ছেলেটি মাছের কাঁটা বা কিছু উচ্ছিষ্ট ফেলে দিচ্ছিল। কুকুরের লোভ ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। সে এবার জোর করে কেড়ে খাবার মতলব করল। কিন্তু তখন কলুপত্নী একটি ইট দিয়ে মারতেই কুকুরটি পলায়ন করল।

আমাদের দেশে একদল লোক আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে যেভাবে অনুগ্রহ ভিক্ষা করত, এ চিত্রটি তাদেরই জন্য।

আর সেই কলুর গোয়ালঘরে একটি বহিরাগত বৃষ যখন জাবর খেয়ে গেল, কলুপত্নীর তাড়নায় সে ভ্রূক্ষেপই করল না তখন লেখকের মনে হল, এই হল জাত পলিটিক্স। জোর করে আদায় করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বিপ্লবের এবং শক্তির পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন তার প্রমাণ আছে—'রাজসিংহ' ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে।

পশুপ্রীতি (ধর্ম: ২৫ অধ্যায়) ॥

হিন্দুধর্মের প্রীতি-প্রদর্শনের ব্যাপারটি যে কত ব্যাপক তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। হিন্দুরা গৃহপালিত জীবকে অত্যন্ত ভালবাসে। বৌদ্ধধর্মের যে জীবে দয়া তাও এই হিন্দুধর্ম থেকেই গ্রহণ করা। পশুপ্রীতির জন্যই হিন্দুদের কাছে গরু দেবতাতুল্য। কারণ গরুর মত উপকারী প্রাণী খুব কমই আছে। তাই হিন্দুদের কাছে গোহত্যা অধর্ম।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত (বিবিধপ্রবন্ধ ১ম) ॥

প্র: প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।

'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে লৌকিক এবং অলৌকিক বিষয় অবতারণার উপযোগিতার আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে ইহজগতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। "কাব্যরসের সামগ্রী মানুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।" তবুও যে বিভিন্ন মহাকাব্য বা উৎকৃষ্ট কাব্যে দেবচরিত্র বা অন্যান্য অলৌকিক চরিত্রের কাহিনী আছে, তার রসগ্রাহীতার কারণ দেবচরিত্রগুলিকে যথাসম্ভব মানবিক গুনমণ্ডিত করা হয়েছে। প্রবন্ধের সামান্য অংশেই লেখক প্রকৃত ও অতিপ্রকৃতের আলোচনা করেছেন। তারপর 'Paradise Lost' ও 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অতিপ্রকৃত বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—"দেবচরিত্র প্রণয়নে তিনি (কালিদাস) মিল্টন্ অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।"

প্রক্ষিপ্তনির্ব্বাচনপ্রণালী (কৃ. চ: ১ম/১০) ॥

কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় মহাভারতের কোন্ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তা বিচার করবার জন্য বঙ্কিম মোটামুটি সাতটি সূত্র নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে কতকগুলি এরূপ—পরস্পরবিরোধী কোন বৃত্তান্ত থাকলে একটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করতে হবে। আবার কোন মহান চরিত্রের কোন জায়গায় যদি গুরুতর অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে সেই অসঙ্গতির অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করতে হবে।

প্রভাস (কৃ: চ: ৭ম খণ্ড) ॥

'কৃষ্ণচরিত্রের এই সংক্ষিপ্ত সর্বশেষ খণ্ডটিতে দু'টি পরিচ্ছেদ কৃষ্ণজীবনের শেষ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা (কৃ: চ: ১/৭) ॥

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা পাণ্ডবগণের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে মত মানেন না। এখানে তিনি মহাভারতের নিকটবর্তী গ্রন্থ পাণিনি থেকে কয়েকটি সূত্র উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, তার মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবের নাম এবং মহাভারতের আরো কয়েকটি চরিত্রের নামের উল্লেখ আছে। এছাড়া—"আশ্বালায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।"

পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা—ইউরোপীয় মত (কৃ: চ: ১/৬) ॥

বিভিন্ন ইউরোপীয় পণ্ডিত যেভাবে পাণ্ডবগণের ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের মত খণ্ডন করেছেন। এখানে তিনি অনেকের পণ্ডিতম্মন্যতাকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি।

পাণ্ডবের বনবাস (কৃ: চ: ৪/১১) ॥

বনপর্বে যে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি নারদবাক্য—(বিবিধপ্রবন্ধ ১ম) ॥

প্র: প্রকাশ—বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০।

মহাভারতের সভাপর্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে যে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলিই এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য এই যে—রাজনীতি ভারতবর্ষের বহু প্রাচীনকালের জিনিষ এবং পাশ্চাত্যদেশের তা থেকে অনেককিছুই শিক্ষণীয় আছে।

প্রাচীনা এবং নবীনা—(বিবিধপ্রবন্ধ ১ম) ॥

প্র: প্রকাশ—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ও আষাঢ় ১২৮১।

প্রবন্ধটিতে প্রাচীনকালের এবং বর্তমানকালের স্ত্রীলোকের দোষগুণ ও সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রবন্ধরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন—"আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।" অর্থাৎ বঙ্কিম এখানে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে সামাজিক অগ্রগতি কতটুকু সম্ভব হয়েছে তার বিশ্লেষণ করতেই এসেছেন।

সমাজে স্ত্রীজাতির যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পুরুষেরা বিভিন্ন বিধিনিষেধে স্ত্রীজাতিকে সর্বদাই আবদ্ধ রাখতে চায়। তাই দেখা যায় 'সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত'।

তারপর তিনি প্রচীন বঙ্গদেশীয় রমণীদের কিছু রসসিক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। সেই বর্তমান তুলনায় যুগের রমণীদের কিছু রুচির সংস্কার হয়েছে। কিন্তু এছাড়া অনেক বিষয়ে আধুনিকাদের দোষও আছে। যেমন—'তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য।' 'নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম সম্বন্ধে।' এই সমস্ত দোষ দূর করতে শিক্ষার দরকার, কিন্তু সে শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ হলে চলবে না।

এ পর্যন্ত প্রবন্ধটি গুরুতর বা মূল আলোচনা। কিন্তু তারপর 'তিনরকম' অধ্যায়—'এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে লিখিত হইয়াছিল।' প্রথম পত্রখানি উগ্র প্রাচীনা মহিলা শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবীর, দ্বিতীয় পত্রখানি উগ্র নবীনা শ্রীলক্ষীমনি দেবীর, এবং তৃতীয় পত্রখাম পুরুষবিদ্বেষী শ্রীরসময়ী দাসীর।

পত্র তিনখানিতে কিছু সত্য যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এতে বঙ্কিমের কমলাকান্তী মনোভাবই অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—(সম্পাদকীয় উক্তি) (পুঃ অপ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১, পৃঃ ৪৮০।

বঙ্গদর্শন সমালোচনার জন্য প্রেরিত বহুসংখ্যক পুস্তক বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এরপর থেকে এই পত্রিকায় আর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হবে না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন—(পুঃ অপ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—বঙ্গদর্শ, চৈত্র ১২৭৯, পৃ ৫৭১-৭৬।

এখানে দু'টি গ্রন্থের সমালোচনা করা হয়েছে। একটি রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থ ও অন্যটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসন। রাজনারায়ণবাবুর গ্রন্থটিতে ব্রাহ্মধর্মের গুণগান করা হলেও, যেহেতু, ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের একাংশ এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রশংসা করেছেন। রাজনারায়ণবাবু যে কবিতাটি উদ্ধার করেছিলেন—"মিলে সবে ভারতসন্তান…", সেটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বরচিত ভেবে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এটি রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রও যে কেবল বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য চিন্তা করতেন, এখানে তার প্রমাণ আছে।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনটির বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেছেন।

প্রীতি (ধর্মঃ/২১) ॥

হিন্দুধর্মের সারকথা হল প্রীতি। প্রীতিই ভক্তির মূলমন্ত্র। আত্মপ্রীতি থেকে মানুষের পরিবারের প্রতি প্রীতি জন্মায়। পারিবারিক প্রীতিই বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশপ্রীতিতে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য-দেশের লোকেরা এই দেশপ্রীতিকেই চরম বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু দেশপ্রীতিরও উর্দ্ধে রয়েছে লোকপ্রীতি যাতে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণকামনা করা যায়। আমাদের দেশে সেই বৃহত্তর প্রীতি—লোকপ্রীতিই প্রচলিত।

স মা লো চ না

উদ্বাস্তু—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ; সাহিত্য সংসদ। ৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, পৃঃ-৩৪৪, মূল্য-দশ টাকা।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে ভারতের মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলি কেটে নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, যার নাম হয় পাকিস্তান। ভারত বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব প্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হয় তার কারণ এই ছিল যে এই দুই প্রদেশের কিছু অংশে ছিল হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিছু অংশে ছিল মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, আর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদ্য বিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়। অবস্থার চাপে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সমস্ত হিন্দু ও শিখ পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসে অনুরূপ ভাবে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমানেরা ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাঞ্জাবে চলে যায়। যদিও লোক বিনিময় পাকিস্তান ও ভারত সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল না, তবুও কার্যতঃ উভয় পাঞ্জাবেই লোক বিনিময়ই ঘটে ছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে পলায়িত মুসলমানদের ভূমি ও ঘর বাড়ি প্রভৃতি পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে প্রভূত সহায়তা দিয়েছিল, এদের নিয়ে ভারত সরকারকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় নি। অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বকালে কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গে বিশেষ ভাবে নোয়াখালিতে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটলেও স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে উভয় বঙ্গে উল্লেখযোগ্য দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে নি। লোক বিনিময়ে পাকিস্তান সরকার বা ভারত সরকার উৎসাহিত ছিল না—কাজেই স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় নি। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত মুসলমান উদ্বাস্তুদের নিয়ে পাকিস্তান অবশ্যই বিব্রত হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান বিতাড়নের অপচেষ্টার অভাবে—পাকিস্তান সরকারকে তার দেশের পূর্ব প্রান্তে কিছুমাত্র উদ্বেগ ভোগ করতে হয় নি। পাকিস্তান সরকার পূর্ব প্রান্তে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে থাকলেও ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মাথা ব্যথা সুরু হতে দেরী হয়নি। দেশবিভাগের অল্পকাল পরেই পূর্ববঙ্গের সঙ্গতিপন্ন সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুরা দীর্ঘকাল ধরে পূর্ববঙ্গে যে সব সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সুবিধা ভোগ করতেন তা ভোগের সম্ভাবনা নাই দেখে পূর্ব বাঙ্গলা ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকেন। এঁদের আগমনের ফলে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের দরিদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরাও ভারতে আসতে সুরু করেন এবং এর ফলেই ভারতে তথা পশ্চিলবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়। খুব ব্যাপক ভাবে প্রথম দিকে উদ্বাস্তুরা আসেন নি। যত দিন যেতে থাকে পূর্ব বাঙ্গলার নেতৃহীন

হিন্দুদের মনোবলও ততই ভাঙতে থাকে, এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ এ পূর্ব বাঙ্গলায় ব্যাপক ভাবে হিন্দু-নির্যাতন, নারী-ধর্ষণ, নারী-হরণ দেখা দিলে উদ্বাস্তু স্রোত এসে পশ্চিম বঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছু মুসলমান পরিবার পূর্ব বঙ্গে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাদের বাস্তুত্যাগে পশ্চিমবঙ্গ উপকৃত হয় নি, এদের পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী বা সম্পত্তি পশ্চিম বঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের সাহায্যে লাগানো যায় নি, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের এই ইচ্ছা ছিল না। ১৯৫০এ যে নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা এক তরফা ভাবে ভারতই মেনে চলেছিল, পাকিস্তান তাকে কানাকড়ির মর্যাদাও দেয় নি। নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরের পূরও দীর্ঘ দিন ধরে পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত লাঞ্ছিত হিন্দুরা সর্বহারা হয়ে ভারতে বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গে ছুটে এসেছে, অল্প কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু ত্রিপুরা ও আসামে আশ্রয় পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু উদ্বাস্তুকে ভারতের কয়েকটি রাজ্যে—দণ্ডকারণ্য এলাকায় এবং আন্দামানে ও পুনর্বাসন দিয়েছেন। উদ্বাস্তুদের বেশির ভাগ অংশের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গকেই বহন করতে হয়েছে। মানবতার বিরুদ্ধে যে পাপ আচরণ পাকিস্তান করেছে বিশ্ব জনমত তার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু প্রতিবাদ করে নি। অতি সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই বিভক্ত ভারত ও দ্বিখণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গকেই প্রায় ৬০/৭০ লক্ষ ছিন্ন মূল উদ্বাস্তুর বোঝা বহন করতে হয়েছে। ১৯৭১ এর জুন মাসে বর্বর পাকিস্তানী পীড়নে পূর্ব বাঙ্গলার ৯০ লক্ষ অসহায় হিন্দু-মুসলমান উদ্বাস্তু ভারতের বুকে যখন এসে পড়েছে তখনও একথা বলা সত্যের অপলাপ হবে যে গত ২৩ বছরের আগত উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান আমরা করতে পেরেছি। এদের সকলকে আমরা মানুষের মত বাঁচার উপায় করে দিতে পেরেছি।

বর্তমান উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভবের কিছু আগে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার বাঙ্গলা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একজন স্বনামধন্য পুরুষ। একজন দক্ষ ও বিবেকশীল প্রশাসক হিসাবেও তিন সুপরিচিত। ১৯৪৭এ উদ্বাস্তুরা যখন থেকে পশ্চিম বঙ্গে আসতে সুরু করে প্রায় সেই সময় থেকেই জেলাশাসক হিসাবে তিনি উদ্বাস্তু ত্রাণের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৯ এর জুনমাস থেকে ১৯৫২-এর শেষভাগ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ ও পুনর্বাসন সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এরপর থেকে অবসর গ্রহণের প্রাককাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন বিভাগের মহাধ্যক্ষ ছিলেন, এই কাজের সঙ্গেও উদ্বাস্তু সমস্যাটি জড়িত ছিল। সুতরাং উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতিটি দিক সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা যে কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লক্ষ লক্ষ নরনারী ভীতগ্রস্ত হয়ে একটি তথাকথিত সভ্য রাষ্ট্র থেকে পালিয়ে এসে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, যে রাষ্ট্রে তারা এসে আশ্রয় নিচ্ছে সে নিজেই শত সমস্যায় বিব্রত—নিজের রাষ্ট্রের প্রজাদের খাওয়া পরা-আশ্রয়ের ব্যবস্থা যে করে উঠতে পারেনি—ইতিহাসের একটি বৃহত্তম ট্র্যাজেডি এই সমস্যাটি সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় সামান্য আলোচনা হয়েছে কোন পুস্তক লিখিত হয়নি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আলোচ্য পুস্তকটি সেই অভাব দূর করবে, ভবিষ্যতের বাঙ্গালী বুঝতে পারবে স্বাধীনতার জন্য কি মূল্য দিতে হয়েছে। লেখক নিজে সরকারী কর্মচারী হিসাবে সুদীর্ঘকাল ধরে উদ্বাস্তু ত্রাণ কার্য পরিচালনা করলেও এই বইয়ের কুত্রাপি লেখক 'খুব একটা বাহাদুরি করে ফেলেছি' এই ভাব দেখান নি। বইটি অতিশয় তথ্যনিষ্ঠ, সরকারী প্রচার বা সাফাই গাইবার বিন্দুমাত্র

প্রচেষ্টা এই বইয়ে নেই। উদ্বাস্তুদের প্রতি আন্তরিক দরদ এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে রেখেছে। উদ্বাস্তু নেতারা সময়ে সময়ে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, এমন কি উদ্বাস্তু স্ত্রীলোকেরা তাঁকে একবার আপিসের মধ্যে অভূতপূর্ব অবস্থায় সারারাত্রি অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন, উদ্বাস্তুত্রাণ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁর জীবনও বিপন্ন হয়েছিল কিন্তু এর জন্য লেখক কোথাও ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি, আশ্চর্য সহানুভূতি দিয়ে লেখক উদ্বাস্তুদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এদের জন্য আরও কত কি করা উচিত ছিল—কতটুকুই বা করতে পেরেছি—লেখকের এই সূক্ষ্ম মনোভাবটি সমস্ত রচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। লেখকের অল্প কয়টি রেখার আঁচড়ে উদ্বাস্তু দরদী ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের যে মূর্তি ফুটে উঠেছে তা পাঠকের মনে গেঁথে যাবার মত। উদ্বাস্তুদের প্রতি সুবিচারের জন্য অনিচ্ছুক কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এদের সংগ্রামের তথ্যগুলি পাঠকদের গোচরে এনে লেখক বাঙ্গালী পাঠককে এদের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করেছেন। লেখকের ভাষা অতি হৃদয়গ্রাহী, বর্ণিত নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা মনের উপর ছাপ রেখে যায়, একটি সৎ উপন্যাস পাঠের আনন্দ দেয়।

এই পুস্তকটি "উদ্বাস্তু" সম্বন্ধে শুধু একটি মূল্যবান ডকুমেণ্টই নয়—এই সমস্যা সমাধান কল্পে নানা পথের ইঙ্গিতও এতে পাওয়া যাবে, গুলি ঠেকে শেখা, কাজেই ভবিষ্যতের পক্ষে মূল্যবান। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে এককালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন মহাধ্যক্ষ শ্রীঅন্যোপাধ্যায় দণ্ডকারণ্যে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের বহুলক্ষ অর্থব্যয়ে পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করেন নি। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা যে ত্রুটিযুক্ত তার প্রমাণ এই যে প্রায় একলক্ষ উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য গিয়েও ফিরে এসেছে। লেখক এদের জন্য চিন্তিত, কারণ সংকারের গৃহীত নীতি অনুসারে এরা আর কোন সাহায্য পাবে না, এরা পশ্চিমবঙ্গের ভারস্বরূপ হয়ে থাকবে। লেখক বলতে চেয়েছেন দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার টাকা পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় করলে—এতে উদ্বাস্তু এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয়েরই লাভ হত। এরা এখন পশ্চিমবঙ্গের দায় না হয়ে স্বাবলম্বীরূপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে বলবান করে তুলতে পারত।

লেখকের মতে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ জুড়ে যে সুন্দরবন তার পরিমাণ ১৫,০০ বর্গমাইল। একশত বর্গমাইলে ৬০,০০০ একরের ওপর জমি পাওয়া যায় তাতে অনায়াসে ২০,০০০ উদ্বাস্তুকে বসান যায়। তারপর এই প্রাথমিক উৎপাদকদের ভিত্তি করে শিক্ষক, দোকানদার ছুতোর, কুমার, কামার প্রভৃতি মানুষও আরও শতকরা দশভাগ বসান যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে সুন্দরবনে জঙ্গল পরিষ্কার করে কি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। লেখক নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন—হেরোডাঙ্গার উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সফল পুনর্বাসনের দৃষ্টান্ত দিয়ে। লেখক দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যে এখানে দণ্ডকারণ্য হতে অনেক সহজ পথে পুনর্বাসন সম্ভব। আর একথা নিশ্চিত যে এখানে যারা পুনর্বাসন পাবে তারা উপনিবেশ ত্যাগ করে চলে আসতে চাইবে না। লেখকের এই মতামতের গতি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী ও উদ্বাস্তু ত্রাণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। উদ্বাস্তুরা আমাদের আপনজন, বিপদের মুখে পড়ে

রাজনীতির শিকার হয়ে এঁরা ভারতে এসেছেন, দেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষদেরও এঁদের প্রতি একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। আশাকরা যায় এই বইটি তাঁদের কাছেও সমাদৃত হবে।

উদ্বাস্তুদের অস্বাভাবিক জীবন যাত্রা নিয়ে গল্প-উপন্যাস ও সিনেমা হয়েছে, এতে উদ্বাস্তুদের কোন সুবিধা হয় নি, উদ্যোক্তাদের পকেটে অবশ্য কিছু পয়সা এসেছে। এই বইখানি গল্প উপন্যাস রম্যরচনা নয়, মুনাফার আশায় ছাই দিয়ে যে দুঃসাহসী প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তুদের কল্যাণের আশায়, সমাজসেবীদের ব্যবহারের জন্য এ বই ছেপেছেন—তাদের আমরা বহু ধন্যবাদ জানাই।

এইসঙ্গে আমরা এই গ্রন্থের লেখকেরও দীর্ঘজীবন কামনা করি। বাঙ্গলাদেশের সামনে যে দুর্দিন ঘনীভূত হচ্ছে তাতে লেখকের মত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, চরিত্রবান ও দরদী মানুষের প্রয়োজন আছে। শারীরিক সামর্থ্যে না হলেও বুদ্ধিও পরামর্শ দিয়ে এঁরা জাতিকে এই দুর্দিনে নানাভাবে সাহায্য করতে পারেন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত